মেঘের পরে রোদ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মেঘের পরে রোদ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
(প্রকাশন বিভাগ)
৭৩, মহাত্মা গান্ধি রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

MEGHER PARE RODE
A Bengali Novel
By SYED MUSTAFA SIRAJ
Rs. 50/-

প্রকাশক : অজিতকুমার জানা
প্রযত্নে অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৫

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

বর্ণগ্রন্থন : পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কলকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক : স্টারলাইন
১৯ এইচ/এইচ/১২ গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

ISBN : 81–86036-85-7

দাম : ৫০ টাকা

হুট করতেই বাবা ও মায়ের মধ্যে খিটিমিটি বেধে যায়। উত্তরা বারবার এ রকম দেখে আসছে এবং এতে সে অভ্যস্ত। যখন সে ছাত্রী ছিল, দুমদাম শব্দে বই বুজিয়ে বা টেবিল ঠুকে বিরক্তি দেখাত—আঃ! এবার ফেল করিয়ে ছাড়বে দেখছি! কখনও কৌতুকে জজ সাহেবের মতো বলত—অর্ডার! অর্ডার। তখন বাবা দীননাথই কাঁচুমাচু হয়ে যেতেন। বলতেন, ঠিক আছে। ওকে এখন ডিসটার্ব করা ঠিক নয়। চলো—ওঘরে চলো। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি।

দীননাথ বরাবরই আপোষপন্থী মানুষ। কিন্তু ক্ষমা—উত্তরার মা, গোঁ ধরে থাকতেন। ঝগড়া তো তিনি করছেন না। বলছেন, এই অত্যাচারী লোকটার পাল্লায় পড়ে ইহকাল-পরকাল সব গচ্চা গেল। উত্তরাই বলুক না, এটা কি ঝগড়ার কথা হ'ল।

পাল্টা দীননাথের বক্তব্য—হ্যাঁ, বলুক। উত্তরাই বলুক। ও তো আর কচি মেয়ে নয়—রীতিমতো সাবালিকা। ইংরেজিতে এম এ পড়ছে। বলুক না ও, আমি অত্যাচারী নাকি! কী অত্যাচারটা করি বলুক—ওকেই সাক্ষী মানলুম।

উত্তরা হাসি চেপে বলেছে, উঁহু। আজি জাজ। সাক্ষী হওয়া পোষায় না।

সে বরাবর জেনেছে, ঝগড়াঝাঁটি না করে ওঁরা থাকতে পারেন না। তাই বলে ব্যাপার বেশিদূর গড়াবেও না। বেশি কিছু হলে বাবা যাবেন কুসুমপুর গাঁয়ের বাড়িতে—নয়ত বেচুবাবুর ডাক্তারখানায়। আর মা যাবেন রাস্তার ওপাশে সেই রিটায়ার্ড হেডমিস্ট্রেস মহিলার কাছে—নয়ত গুরুদেবের বেহালার আশ্রমে। দুজনেই বেরোলে জগার মা ননীবালার হাতে সংসার। উত্তরার একটু মুশকিলই হয়। বুড়ি বড্ড চুরি করে।

কিন্তু চুরি হলে অবশ্য ভালোই। কর্তা-গিন্নি ফিরে এসে একবাক্যে ননীবালাকে আক্রমণ করেন এবং তাতে দুজনের সব মতবিরোধের অবসান ঘটে যায়। রাঁধুনী বামনী ননীবালা চুপচাপ কাজ করে যায়। সে ভালো ভাবেই জানে, তাকে কর্তা-গিন্নি ছাড়াবেন না। ছেড়ে সুখ পাবেন না। ননীবালা দীননাথের বাবার আমলে এ বাড়িতে ঢুকেছে। তার ছেলে জগাও এ বাড়ির পয়সায় লেখাপড়া শিখেছে। রাঁচিতে চাকরি করে। বিয়ে করেছে। মা ঝি, এটা অসহ্য হলেও উপায় নেই। ননীবালা যাবেই না। উত্তরা এর গূঢ় কারণটা জানে।

বুড়ি পোস্টাফিসে প্রচুর টাকা জমিয়েছে। উত্তরাকে সে বলেছে, জগন্নাথ টের পেলে এই ব্যাঙের আধুলিটি যাবে। পেটের ছেলে—আমি জানিনে আবার? তাতে বউমাটির যা খাকতি। সবসময় সাজগোজ, শাড়ি গয়নাগাটি! ও মাসে তো দুদিন থেকে এলুম। নেহাৎ পীড়াপীড়ি করলে—তাই। পাগল হয়েছ মা? আরও কিছু চাকর-বাকর লোকজন আছে বাড়িতে। সেই নিয়ে সংসারটা বেশ জাঁকাল। আছে দূর সম্পর্কের আত্মীয় নগেন—ছোটখাটো চাকরি করে এবং গ্রামের বাড়িতে টাকা পাঠায়। এ বাড়িতে সে মাগনা থাকা খাওয়াটা পায়। দীননাথের এই পৈতৃক রীতি আছে। আছে একটি ছাত্রও—কলেজে পড়ছে এখন। গ্রামের কোন এক কবরেজ মশায়ের ছেলে। দীননাথের বাবা ছিলেন সেই গ্রামেরই মানুষ। ছোটখাটো জমিদারি ছিল। শহরে-গ্রামে দু'জায়গাতেই থাকতেন। দীননাথ বাল্যে গ্রামেই থাকতেন। পরে শহরে আসেন। সেখানে এখনও কিছু জমিজমা পুকুর বাগান আছে। মাঝে মাঝে তাঁকেও যেতে হয়। শহরে একটা হোসিয়ারির কারখানা খুলেছিলেন। গত বছর শ্রমিক গণ্ডগোল ইত্যাদির জন্য তা তুলে দিয়েছেন। তাঁর মতো মানুষের পক্ষে ও সব ঝামেলা সামলানো অসম্ভব। তার চেয়ে গ্রামের জমি-জমা অর্থাৎ কৃষিকাজ অনেকটা নির্ঝঞ্ঝাট। ফিশারি করেছেন। পোলট্রি করেছেন। প্রায়ই যেতে হয় বলে একটা মোটরগাড়িও কিনেছেন। মোটে তো পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার দূরত্ব।

এই গাড়ি নিয়েও বাবা-মায়ের দ্বন্দ্ব চলে এবং উত্তরা অভ্যাসমতো সকৌতুকে উপভোগ করে। যেমন, দীননাথ জরুরী তলব পেয়ে ড্রাইভার বিপিনকে বলেন, রেডি হও বিপিন, বেরবো। তেল-টেল দেখে নাও। আর ছোকরা চাকর সীতুকে বলেন, আয়, গোছগাছ করা যাক।

এইসব ব্যস্ততা যখন তুঙ্গে পৌঁছেছে, নীচের গেট দিয়ে গাড়িটা সশব্দে বেরিয়ে যেতে দেখা গেল। সীতু লটবহর কাঁধে নিয়ে থমকে দাঁড়ালো। বাড়ির লোকেরা ব্যালকনিতে ভিড় করলো। দীননাথ চশমার কাচ ঝটপট মুছছেন আর চোখে দিচ্ছেন, আবার মুছছেন, এবং পরছেন। ভেল্কিটা ঠাহর করছেন। এই সময় চাপা হেসে উত্তরা জানালো, মা কালীবাড়ি গেল। অষ্টপ্রহর আছে। ফিরতে রাত হবে।

দীননাথ ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, বেচে দেবো। তিন পয়সায় বেচে দেবো। এক্ষুনি যাচ্ছি মল্লিক বাজারে।

বেচে দেওয়া হয় না। উত্তরা তক্কে তক্কে থাকে। বিপিনের কাছে ড্রাইভিং রপ্ত করে নিয়েছে। বেগতিক দেখলে বেরিয়ে পড়ে গাড়িটা নিয়ে। শহরতলির দিকে চক্কর মেরে বেড়ায়। একদিন তো বোম্বে রোড হয়ে কোলাঘাট অব্দি চলে

গিয়েছিল। ফেরার পথে এক জায়গায় আচমকা ইঞ্জিন বন্ধ। কি বিপদ, কি বিপদ!

এখনও উল্টো হয়। ক্ষমা বেরোবেন তৈরি, উত্তরা মিটিমিটি হেসে জানায়, বাবা কুসুমপুর গেলেন। ট্যাক্সি ডাকতে বলব মা?

ক্ষমাও ক্ষেপে যান।—নেবো না তোর বাবার গাড়ি! সাতপুরুষে গাড়ি দেখেছে? আমার মামার ছিল তিন-তিনটে গাড়ি। একটা বিলিতি অস্টিন, একটা ফোর্ড, একটা...

উত্তরা বলে, মার্সেডিস।

তুই থাম! তুই তো ওর মেয়ে, আমার কেউ নোস! সে আর জানিনে? বাপ-মেয়ে গোপনে ষড়যন্ত্র করে আমাকে সব সময় বিপদে ফেলতে পারলেই তোদের সুখ! ঠিক আছে। চাপব না তোদের গাড়ি। এই আমি নাক কান মলছি। ধিক আমাকে! এখনও লজ্জা নেই!

ক্ষমা কান্না চেপে ঘরে ঢোকেন। সে আবার বড্ড জটিল পরিস্থিতি। উত্তরা অমনি বিব্রত হয়ে পড়ে।...

এই গাড়ির ব্যাপারে কর্তা-গিন্নি মুখোমুখি হলে ড্রাইভার বিপিনের অবস্থাটা খুব করুণই হয়। সে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিপন্ন মুখে ঘামে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। কর্তাই আইনত তার মালিক। কিন্তু গিন্নিকেই বা অস্বীকার করে কেমন ভাবে? হঠাৎ অভাবে পড়লে গিন্নিমা দু-দশ টাকা দেবেনই। ওঁর ওই এক দুর্বলতা। কর্তা তো প্রায় সময় মেজাজী হয়ে থাকেন। ধরতে সাহস হয় না। কিন্তু গিন্নির কাছে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়ালেই উনি তক্ষুণি উদ্বিগ্ন মুখে পেটের খবর নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।—কী রে? অসুখ-বিসুখ করেছে? করেনি? তা অমন চেহারা কেন? বাড়ির খবর খারাপ! কী হল কী?

সুতরাং বিপিন বিপন্ন হয়। কর্তা বলেন, আহা, বুঝছ না কেন? আমার এই জরুরী ব্যাপারটা এক্ষুণি না সেরে এলেই নয়। তুমি বরং ওবেলা যাবে। কী বলিস বিপিন?

ক্ষমা বলেন, তোমার মাথা খারাপ! গুরুদেবের গুরুদেব এসেছেন হিমালয় থেকে। মাত্র একবেলা থেকেই চলে যাবেন। বিপিন, চল বাবা। আমাকে নামিয়ে দিয়ে ওঁকে নিয়ে যাবি বরং।

দীননাথ বললেন, কি অবাক! আমি যাবো টালাপার্কের কাছে। তুমি যাবে বেহালা। বরং আমাকে নামিয়ে দিয়ে...

ক্ষমা এবার রুদ্রমূর্তি ধরেন।—বটে! এত তোমার কাজ! ওই বিষয় বিষয়

করেই তুমি যাবে, হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে! তাই যাও! আমারই লজ্জা নেই!

বিপিন গাড়ি স্টার্ট দিল। কিন্তু কিমাশ্চর্যম! কিছুতেই গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না! ঘড় ঘড় করে উঠেই চুপ হয়ে যাচ্ছে। বিপিন উদ্বিগ্ন মুখে নামে। আর ওদিকে ক্ষমা হাততালি দিয়ে বালিকার মতো হাসেন।—কী? যাও, যাও এবার! এবং করজোড়ে চোখ বুজে গুরুদেবকে প্রণাম করেন।

দীননাথ চ্যাচান, সীতু! তোরা আয়! ঠেলে দে! ঠ্যাল!

উত্তরা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কেলেঙ্কারি দেখতে দেখতে হাসে। হাসতে হাসতে পরে বিরক্ত হয়। আর কতকাল এই সব লোক-হাসানো আচরণ করে যাবেন ওঁরা? এতদিনেও কি ক্লান্তি আসে না, দুজনের চুলেই তো পাক ধরেছে!

ঠিক এই রকম দ্বন্দ্বের পর দীননাথ সেদিন সকালে রেগে-মেগে ট্যাক্সি ডেকেই বেরিয়ে গেলেন। রোগা ঢ্যাঙা মানুষদের রাগ। হুট করতেই মাথায় আগুন ধরে যায়। যাবার সময় বলে গেলেন, উত্তরা, আমি আর আসব না বলে গেলুম, হ্যাঁ। কুসুমপুরে পাকাপাকি থেকে যাবো। খবর্দার! তোরা কেউ আমায় ডিসটার্ব করতে যাবিনে! আর তোর মাকে বলে দে, মনের আনন্দে গাড়ি চেপে বেড়াক। যা খুশি করুক। এই শেষ দেখা।

ক্ষমা মোটাসোটা মানুষ। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, আমি যা খুশি করি? শুনলি, শুনলি কথাটা? আমায় বলে যা খুশি করি! তোরা বল তো, কী করি আমি!

কান্নাকাটি শোনার আগে দীননাথ অদৃশ্য। উত্তরা মাকে সামলাতে ব্যস্ত হল। ক্ষমা ঘরে ঢুকে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, আর আমি ওর অন্নজল ছোঁবো না। এই আমি প্রতিজ্ঞা করলুম। দেখি কে আমায় খাওয়ায়! খাব না, কিছু খাব না, উপোস করব।

ঘরের কোনায় জলচৌকিতে গুরুদেবের ছবি। সেখানে পড়ে রইলেন ক্ষমা। উত্তরা জানে, আপাতত মা এক্তিয়ারের বাইরে। পরে চেষ্টা করা যাবে'খন।

কিন্তু আজকাল এসব দেখে শুনে উত্তরার বড্ড খারাপ লাগে। সে তার ঘরে গিয়ে চুপচাপ বসে রইল। কিছু পড়বে ভাবল, পারল না। রেডিওগ্রাম বাজিয়ে গান শোনার চেষ্টা করল, তাও ভালো লাগল না। এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে পারলে বাঁচা যেত যেন। উঃ! সেকেলে ধরনের এই লোকগুলো একালের পৃথিবীতে কি পরিমাণ না জ্বালাচ্ছে! উদ্ভট উদ্ভট তাদের সমস্যা। কোনো মাথামুণ্ডু নেই। ওই তো শ্যামলীর বাবা-মা আছেন। তাঁদেরও মাথার চুল

পেকেছে। চিন্তাধারা জীবন যাত্রা সবকিছুই অন্যরকম। তবু কোনো মতান্তর বা মনান্তর ঘটলে কিছুতেই টের পাওয়া যাবে না। সব দীনতা চেপে রাখতে শিখেছেন ওঁরা।

আর দীননাথ-ক্ষমা একেবারে উল্টো। আসলে দুজনেই মূলত গ্রামের মানুষ। সেটাই হয়েছে এইসব আচরণ বা হঠকারিতার কারণ। খুব জোরে কথা বলা গ্রামের লোকের অভ্যাস, উত্তরা তার অল্প অভিজ্ঞতায় দেখে এসেছে। মাঝে মাঝে কুসুমপুরে দাদুর বাড়িতে সে গেছে। ভারি সুন্দর জায়গায় সেকেলে গড়নের দোতলা বাড়ি। পিছনে নদী আছে। কিছু এলাকায় জঙ্গল আছে। আজকাল বিদ্যুৎ এসেছে সেখানে। রাস্তাটা পাকা হয়েছে। দেখতে দেখতে ছোটখাটো বাজারও গড়ে উঠেছে। কিন্তু লোকগুলো যেন হাড়ে হাড়ে সেকালের সবরকম গ্রাম্যতা লালন করে চলেছে। ক'মাস আগে উত্তরা বন্ধুদের নিয়ে পিকনিক করে এলো সেখানে। শহরের এত সব মেয়ে দঙ্গলে গিয়ে নাচছে-গাইছে, এতে বিশাল ভিড় জমতে শুরু করেছিল। এমন কি উত্তরা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে দেখে সে কি হুলস্থূল সে রাস্তায় এমনি হেঁটে গেলেও লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কেউ কেউ যেচে পড়ে আলাপ করে।—আমাদের চৌধুরিমশায়ের মেয়ে না? কি কাণ্ড! চেনাই যাচ্ছে না গো! ও যামিনীদা, দেখো, দেখো!

ব্যস, সে আরেক ভিড়। দীননাথ বলছেন, আহা, লোকগুলো আসলে ভালো। বড্ড ভালো। তুই তো এই গাঁয়েরই চৌধুরি বাড়ির মেয়ে। এভাবেই ওরা ব্যাপারটা দেখে, দেখতে ভালোবাসে। এটা বরং তোর সৌভাগ্য মা। আজকাল মানুষের আদর-স্নেহ পাওয়া যায় না!

কিন্তু দীননাথ এবারে কুসুমপুরে যাওয়ার সময় যে সমস্যা সৃষ্টি করে গেলেন, তা জটিলই হল। ক্ষমা সত্যি সত্যি অন্নজল ছুঁলেন না। অনেক সাধাসাধি করা হল। বাড়িসুদ্ধু লোক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। কী শর্তে অন্নজল ছোঁবেন, গিন্নিমা তাও যে বলছেন না ছাই। বিপিন ড্রাইভার গাড়ি রেডি জানাতে এসে ধমক খেল। ক্ষমা যাবে না। ও গাড়িও আর এ জন্মে ছোঁবেন না। শেষে উত্তরা গেল ব্যাপারটা জানতে। এতক্ষণ সে তিতিবিরক্ত হয়ে নিজের ঘরে বসে থেকেছে। জগার মা বা সীতুরা খবর দিতে গেলে ধমক দিয়ে তাড়িয়েছে। কিন্তু আড়াইটে বাজলেও মা যখন গোঁ ধরে রইলেন, উত্তরা মা'র ঘরে ঢুকল।

প্রথমে রাগই দেখাল উত্তরা। বরাবর এই সব সুযোগে সে বাবা-মার গার্জেন হয়ে ওঠে। কিন্তু ক্ষমা—আশ্চর্য, কেমন যেন অন্যমূর্তি। বেশ শান্ত হাবভাব,

যেন প্রতিজ্ঞা পালনে কৃতসঙ্কল্প, সেই ভাবটা মুখে ফুটে উঠেছে। ঠোঁটে একটু হাসিও আছে। বললেন, কী রে? অত চেঁচামেচি করছিস কেন?

উত্তরা ধমকের সুরে বলল, ন্যাকামি রাখো তো! ওঠো, খাবে চলো।

আমার খাওয়া তো হয়ে গেছে মা!

মায়ের মুখে কেমন একটা সম্মোহিত ধরনের অদ্ভুত নির্লিপ্ত ভাব, উত্তরা বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা কী। সে বলল, হয়ে গেছে মানে? কখন হল?

অনেক আগে। গুরুদেব আমায় নিজের হাতে খাইয়ে গেলেন। যা মা, এবার আমায় ধ্যানে বসতে দে। জ্বালাস্‌নে, লক্ষ্মী মেয়ে।

উত্তরা আরও রেগে গেল।—ওসব আজগুবি কথা অনেক শুনিয়েছ, ঢের হয়েছে।

ক্ষমা অমনি অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন, উত্তরা! ছি ছি! ও কী বলছিস! আজগুবি কথা?

হ্যাঁ। ম্যাজিক! বলে উত্তরা ডাকল, জগার মা! শোনো তো এদিকে।

ক্ষমা হাত-পা ছুড়ে বাচ্চা মেয়ের মতো লাফালাফি শুরু করলেন। উত্তরার মেজাজ এমনিতে শান্ত। কিন্তু আজ সেও বাবার মতো মেজাজ ধরল। আরও কিছুক্ষণ সাধাসাধির পর সে বলে উঠল, ঠিক আছে। তাহলে আর আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তোমার। আমি যেদিকে ইচ্ছে, চলে যাচ্ছি। থাকো তুমি, আমি চললুম।

ক্ষমা এবার ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন।

উত্তরা রাঙা মুখে বলল, হ্যাঁ। চললুম। আর কখনো আমাকে দেখতে পাবে না। তারপর সটান বেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল।

একটু পরে ক্ষমা হন্তদন্ত হয়ে উঠলেন। বিস্রস্ত কাপড়চোপড় সামলে উত্তরার ঘরে ঢুকলেন। উত্তরা নেই। সীতু জানাল, দিদিমণি বেরোলেন। ওই যে যাচ্ছেন!

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ক্ষমা দেখলেন উত্তরা হাতে একটা স্যুটকেস নিয়ে লনে দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে বিপিন ড্রাইভার। কিছু বলছে হাত-মুখ নেড়ে। ক্ষমা যথাসাধ্য গলা তুলে বললেন, উত্তরা! আমি খাচ্ছি, খাচ্ছি! ফিরে আয়! উত্তরা ঘুরল না। এই সময় বিপিন দৌড়ে গ্যারেজে ঢুকল। ক্ষমা হন্তদন্ত হয়ে নামতে শুরু করলেন। মোটাসোটা মানুষ। হাঁটুর কাছে কাপড় সামলে সিঁড়ি বেয়ে নামতে সময় লাগল। গাড়ি বারান্দার থামগুলো পেরিয়েই দেখলেন বিপিন একপাশে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে এবং উত্তরা গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেট পেরোচ্ছে।

ডেকে ওঠার আগেই গাড়িটা রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ক্ষমা চোখে জল নিয়ে বিড়বিড় করলেন, শত্রু! সব আমার শত্রু! বাপ যেমন, মেয়ে কি তেমন হবে না? হোক্, আমার কী! কাঁপতে কাঁপতে ক্ষমা আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন। চাকর-বাকরদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, আমার কী? নাইব, খাব, স্ফূর্তি করব! গুরুদেব তো বলেছেনই— ক্ষমা, যা মন চাইবে, কোরো! মনকে বঞ্চনা করে কি ধর্ম হয়? হয় না। অ্যাই সীতু! প্যাটপ্যাট করে কী দেখছিস হতভাগা? বাথরুম খুলে দ্যাখ, জল-টল আছে নাকি। না থাকলে নীচে যা। টিউবেল পাম্প করে জল এনে দে।

সীতু হাসতে হাসতে ছোটে। অন্যরাও হাসে। আপাতত শান্তি এলো বাড়িতে।...বিপিন না বললেও গাড়ি নিতো উত্তরা। তবে বিপিনকে সঙ্গে নিয়ে বেরোবার কথা সে ভাবতেও পারে না। সে গাড়ি চালাবে, আর ওই লোকটা পাশে বসে থাকবে, এটা অশোভন এবং তেমনি অশোভন বিপিন তার গাড়ি চালিয়ে কোথাও নিয়ে যাবে। সে একা থাকতে চেয়েই তো বেরিয়ে পড়ে এমনি করে। বি. টি রোড হয়ে ঘুরে গিয়ে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে পৌঁছতে তিনটে বাজল। কুসুমপুরের কথা সে ভাবেইনি। কিন্তু একটু পরেই হুঁশ ফিরে আসতে দেখল, সে যে রাস্তায় চলেছে এবং যে স্পিডে, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই কুসুমপুর এসে যাবে। তখন সে গতি কমাল। একটা মাঝারি ধরনের নদীর ব্রিজে একপাশে গাড়ি রেখে সে নামল। দু'ধারে ফাঁকা মাঠ। পিছনের দিগন্তে বহুদূরে শহরের ঝলমলানি চোখে পড়ছে, সূর্য ওদিকেই ঢলে পড়েছে। মাঝে মাঝে বাস লরি টেম্পো বা অন্যান্য মোটরগাড়ি যাওয়া আসা করছে। রাস্তায় কোনো লোক নেই। আপাতত যারা যাচ্ছে তারা সাইকেল রিক্শা, সাইকেল, বাস বা মোটর সাইকেলে। সবাই তার দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে। এই সময় একটা প্রকাণ্ড লরি এসে দাঁড়িয়ে গেল এবং পাঞ্জাবি ড্রাইভার হিন্দিতে তার গাড়ি খারাপ হয়েছে কি না জানতে চাইল। অস্বস্তিতে পড়ে গেল উত্তরা। সে হাত নেড়ে বলে দিল, না। কিস্যু হয়নি।

অবশ্য এটা দিল্লি এলাকা নয়। তা হলেও আজকাল দেশের যা অবস্থা হয়েছে। সে তক্ষুনি গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল আবার। আস্তেই চলল। অনেকটা যাবার পর একটা চৌরাস্তা আছে। দোনামনা করে চৌরাস্তা অব্দি এগিয়ে সে গাড়ি দাঁড় করাল আবার।

চারদিকেই নীচু জমি। খরায় খাঁ-খাঁ করছে। জোর হাওয়া দিচ্ছে বলে গরম টের পাওয়া যায় না। এই নির্জনে নিচু মাটি ভরাট করে কিছু বিজ্ঞাপনদাতা

চমৎকার চমক দিয়েছে। একপাশে একটা চায়ের দোকান আর গ্যারেজসহ পেট্রোল পাম্প। দু-তিনটে ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। সারানো হচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ল, বিপিন জানিয়েছিল গাড়িতে তেল পোরার দরকার আছে। নয়তো যে কোনো সময়ই থেমে যাবে। ভাগ্যিস ঠিক জায়গায় কথাটা মনে পড়ে গেল। উত্তরা পাম্পে ঢোকাল গাড়ি।

উর্দি পরা একটা ছোকরা হাঁ করে তাকে দেখছিল, তার হাতে নলটা রয়েছে। উত্তরা গম্ভীর মুখে বলল, ট্যাংক ভর্তি করে দাও।

ছোকরা তেল পুরতে পুরতে দাঁত বের করে হাসল—এই সেদিনকে আপনি এবাগে যাচ্ছিলেন না দিদি? সঙ্গে বুড়োমতো একজন ছেলো!

উত্তরা আরও গম্ভীর হয়ে শুধু বলল, হুঁ।

ছোকরাটা গায়ে-পড়া। মুখে ক্যাবলাকান্ত হাসিটি রেখে আবার বলল, টেরাংক্ এক্কেবারে শুকনো ছেলো দিদি। গাড়ি এলো কেমন করে বলুন তো?

পায়ে হেঁটে। বলে উত্তরা টাকার জন্য পার্স বের করল।

ছোকরা হেসে খুন। সেই সময় কাচঘরের ভেতর থেকে এক অদ্ভুত মূর্তি বেরিয়ে এলো। কতবার এখানে তেলও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই কিম্ভূত লোকটাকে তো দেখেনি। বিশাল দৈত্যের গড়ন এবং প্রচণ্ড কালো লোকটার মুখে অমায়িক হাসি। কপালে আব আছে। এগিয়ে এসে বলল, কী রে পল্টে? হাসছিস কেন রে? এত হাসি কীসের? ছোকরা তক্ষুণি গম্ভীর হল। নলটা গাড়ির পিছনকার ট্যাংক থেকে তুলে ক্যাপ এঁটে যথাস্থানে রাখল। তারপর বলল, পনেরো লিটার লিখুন বাবু।

দৈত্যটি হাঁ করে উত্তরাকে দেখছিল। উত্তরা ভুরু কুঁচকে একটা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিল। অমনি সে হাতটা কপালে ঠেকিয়ে বলে উঠল, নমস্কার স্যার! বলেই ভুলটা টের পেয়ে আবার বলল, ন-নমস্কার ম্যাডাম! চিনতে পারছেন তো? আমি তারক। সেই যে—ইয়ের—

উত্তরা সপ্রশ্ন তাকাল। ইয়েটা কোথায় তার মনে নেই—জানা নেই।

লোকটা একগাল হেসে আবার বলল, আপনার বাবা চৌধুরিমশাই আমায় চেনেন। আপনিও চেনেন—মনে করতে পারছেন না। কিন্তু চেষ্টা করলেই মনে করতে পারবেন! আমি তারক—মানে, সেই যে—ইয়ের—! অ পল্টে! সতুকে বল্, মেমো লিখে চেঞ্জটা এনে দিক।

টাকা নিয়ে পল্টে নামে ছোকরাটা কাচঘরে চলে গেল। উত্তরা ঘড়ি দেখল। সেই তারকদৈত্য ফের মুখ খুলেছে ওদিকে।—খুব দেখেশুনে যাবেন কিন্তু। এদিককার রাস্তায় আজকাল বড্ড উৎপাত হচ্ছে। সামনে কাকেও দাঁড়াতে

দেখলেও ব্রেক কষবেন না—খবরদার! মেরে বেরিয়ে যাবেন। লাশ পড়ে থাকবে, থাক্ আপনার কী? আর ইয়ে—ওদের আরেক রকম ট্রিক্স্ আছে। রাস্তায় মেয়েছেলে দাঁড় করিয়ে রাখে। বুঝলেন? কিন্তু সাবধান—লিফ্ট্ দিয়েছেন কী মরেছেন! হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ!

লোকটার আচমকা এ রকম ভয় দেখানো কথা শুনে উত্তরা ভেতর ভেতর রেগে যাচ্ছিল। কিছু বলে বসত, কিন্তু সেই সময় কে একজন সাইকেল নিয়ে ঢুকল এবং নেমে তারকদৈত্যের পাশে দাঁড়াল।—কী তারকদা? শাসাচ্ছেন কাকে?

তারকদৈত্য ঘুরে বলল, এই যে! এসো, এসো অরুণ! তোমার কথাই ভাবছিলুম। অরুণ নামে আগন্তুকের গায়ে আধময়লা হাতগুটানো পাঞ্জাবি। কাঁধে ঝোলা। তিরিশের মধ্যেই বয়স সম্ভবত। উত্তরাকে একপলক দেখে নিয়ে বলল, বসব না তারকদা। কই, কী দেবেন বলেছিলেন, দিন।

সেই সক্কালে কিনে এনে রেখেছি, এখন অব্দি তেমন কাকেও পেলুম না যে পাঠিয়ে দিই। অগত্যা তোমার পথ তাকিয়ে বসে আছি!...বলে তারকদৈত্য চলে গেল। যেতে যেতে ফের একবার ঘুরে উত্তরার উদ্দেশে বলল, যা বলেছি, ভুলবেন না স্যার!

ভুলটা সংশোধিত হল কি না উত্তরা টের পেল না, পল্টে তাকে মেমো আর চেঞ্জটা দিতেই যে ঝটপট গাড়ি স্টার্ট দিল। সমস্ত ব্যাপারটা তার হাস্যকর লাগছিল। যেন হঠাৎ বাড়ি থেকে চলে এসে এক অদ্ভুত পৃথিবীতে ঢুকে পড়েছে সে। এরপর আরও কত অদ্ভুত মানুষ সে দেখতে পাবে, কত রকম মজার মজার কথা শুনতে পাবে।

কিন্তু সেই ভয় দেখানোর ব্যাপারটা ভেতরে ভেতরে তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল উত্তরা। এক সময় হঠাৎ টের পেল সে কুসুমপুরের দিকেই চলেছে। অমনি গতি কমাল। রাস্তাটা পীচের হলেও খুব একটা চওড়া নয়। সামনে থেকে গাড়ি এলে চাকা নামাতেই হবে ধুলোয়। ব্রেক কষে গাড়ি থামাল সে। ভাবল, এমনি করে বাবার কাছে গিয়ে পড়াটা কেমন দেখাবে! তাছাড়া এখন বাবার পাল্লায় পড়া মানে সারাক্ষণ মায়ের বিরুদ্ধে নালিশ শোনা। একলা তাকে পেলে কান ঝালাপালা করে দিয়ে ছাড়বেন দীননাথ। অথচ গাড়ির লক্ষ্য অবচেতনায় যেন ঠিক করা আছে। তা না হলে এই রাস্তায় এসে পড়ত না।

পেছনে সাইকেলের ঘণ্টা বাজতেই উত্তরা আয়নায় দেখল পেট্রোল পাম্পের সেই সাইকেলওয়ালা। কিন্তু ঘণ্টা বাজাবার কী আছে, সে বুঝতে

পারল না। হয়তো অভ্যাস। একটু হাসল উত্তরা। লোকটা সাইকেল নিয়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। বেশ জোরেই বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ তার ওই গতি দেখতে দেখতে নিজেরই অলক্ষে ঠোঁটে কুঞ্চন ফুটে উঠল উত্তরার। এই মুহূর্তে মনে পড়ল, লোকটার তাকানোর মধ্যে এক ধরনের ঔদ্ধত্য আছে, পাম্পে তখন লক্ষ্য করেছিল। উত্তরার গাড়ি এগোলো তক্ষুণি এবং বেশ দ্রুত।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে তার পিছনে গিয়ে পড়ল। বারবার প্রি প্রি আওয়াজেও তার ভ্রুক্ষেপ নেই। রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলেছে। নিছক বদমাইশি ছাড়া কিছু নয়। উত্তরা গাড়ির চাকা নামিয়ে দিতেই দেখল, আবার সামনে পড়েছে সাইকেলটা। নিশ্চয় বদমাইশি। মুখ বাড়িয়ে উত্তরা ধমকের সুরে বলে উঠল, চাপা পড়ার সাধ হয়েছে নাকি? শুনছেন! বাঃ! ভারি অভদ্র তো!

সে একবারও ঘুরল না। গ্রামের মানুষ এমন অভদ্র হয়, তার জানা ছিল না। কখনও দেখেওনি উত্তরা। বিশেষ করে গাড়ি এবং ভদ্রমহিলার প্রতি এমন অভদ্র বদমাইশি কল্পনা করাও যায় না।

সামনে একটা গাছপালা ঢাকা গ্রাম দেখা যাচ্ছিল। রাস্তা এরপর ক্রমাগত ঘুরে ডাইনে বাঁয়ে বাঁক নিতে এগিয়েছে, উত্তরা মোটামুটি চেনে। এভাবে কয়েকশো গজ আসার পর সাইকেলওয়ালা হঠাৎ বাঁদিকে গাছপালার মধ্যে সরু একফালি পায়ে চলা পথে মোড় নিল। অমনি উত্তরা বোঁ করে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে একবার ঘুরে ওকে দেখে গেল। লোকটা এদিকে তাকাচ্ছে না। মাথায় ছিট আছে নাকি? কিন্তু পেট্রোল পাম্পে দেখে তো তেমন কিছু মনে হয়নি।

এরপর আর বড়-বড় ফাঁকা মাঠ নেই। কাছাকাছি সব ছোটো ছোটো গ্রাম এবং প্রচুর গাছপালা। গাঙ্গেয় উর্বর মাটির সম্পদ থরে থরে সাজানো যেন। পড়ে আসা বেলার শান্ত রোদে এই নিসর্গ গভীর স্নিগ্ধতায় ডুবে আছে। সামনে একটা প্রচণ্ড ধরনের বাঁক আবার। বাঁকটা ঘুরেই উত্তরা অবাক। সেই সাইকেল এবং লোকটা আবার সামনে পড়েছে। ব্যাপার কী?

ঠিক পিছনে, মাত্র এক ফুটের ব্যবধান রেখে উত্তরা এগোচ্ছিল। ক্রমাগত প্রি প্রি শুনে সাইকেলওয়ালা তেমনি নির্বিকার। রাস্তার দুপাশে কিছু গ্রাম্য মেয়ে ও পুরুষ দাঁত বের করে ব্যাপারটা উপভোগ করছে। উত্তরা ক্ষেপে গিয়ে মুখ বের করল। কিছু কড়া কথা বলবে ভাবল। কিন্তু তাতে গ্রাম্য লোকগুলোর কাছে আরও হাসির ব্যাপার ঘটবে ভেবে থেমে গেল। সে গাড়ির গতি একেবারে কমিয়ে আনল। লোকটা কিন্তু নিজের গতিতেই চলেছে বরাবর। গ্রামটা শেষ

হতেই একটা বাঁক পড়ল। তারপর দেখা গেল সে আগের মতোই হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে অদৃশ্য হল।

এবার নিশ্চয় আপদ চুকেছে। উত্তরা নিশ্চিন্ত হয়ে এগোলো। খুবই দ্রুত। কিন্তু কিমার্শ্চযম! আবার বাঁক ঘুরতেই একই দৃশ্য। উত্তরা হতভম্ব। এই মিরাক্‌ল কীভাবে সম্ভব হচ্ছে!

শুধু তাই নয়, রাস্তা এক জায়গায় খুব খারাপ, হয়তো গত বর্ষার বন্যায় ধুয়ে গিয়েছিল, খুব এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে এবং দুধারে গর্ত রয়েছে। ঠিক সেইখানে লোকটা সাইকেল থেকে নামল এবং হাঁটু দুমড়ে বসে পিছনকার চাকার দম পরীক্ষা করছে।

গাড়ি দাঁড় করাতেই হল। উত্তরা মুখ বের করে বলল, এই যে, শুনছেন?

সে ঘুরল।—আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ।

উঠে হাতের ধুলো অদ্ভুত কায়দায় ঝেড়ে সে বলল, বেশ তো। বলুন।

যা বলব, নিজেই তো বুঝতে পারছেন! আপনার উদ্দেশ্য কী বলুন তো?

বাড়ি ফেরা।

কিন্তু এভাবে পথ আটকে চলেছেন কেন?

তাই বুঝি? দুঃখিত। বলে সে তক্ষুনি সাইকেলটা একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল।—হ্যাঁ, যান। রাস্তা এবার পরিষ্কার।

উত্তরা বেরিয়ে গেল। এবড়ো-খেবড়ো জায়গাটা। তাই আচমকা গতি বাড়িয়েছিল এবং এর ফলে তেমনি আচমকা গাড়িটা কয়েক মিটার এগিয়েই ঘড় ঘড় করে থেমে গেল।

তারপর আর স্টার্ট নেয় না। বেলা পড়ে আসছে। কুসুমপুর আর এক কিলোমিটার এখনও। দুপাশে কাছাকাছি গ্রাম নেই, গাছপালা আর বাঁশবন। উত্তরা ঘেমে উঠল।

কী হল? সেই সাইকেলওয়ালা এগিয়ে এলো।

উত্তরা ঘুরে দেখল মাত্র। কিছু বলল না।

বেশি তেল পুরেছেন তো, তাই। ভাবনার কিছু নেই। এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবে।

উত্তরা গাড়ি থেকে নেমে বলল, উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।

উপদেশ নিই, দিই না। ঠেলে দেবো নাকি?

না।

কিন্তু এই গ্রামগুলোয় চোর ডাকাত আছে। এভাবে একা...

থাক। ভয় দেখাবেন না। আমি কুসুমপুরের চৌধুরিবাড়ির মেয়ে।

হুঁ জানি।

উত্তরা অবাক হয়ে ঘুরল।—জানেন? আপনি কে?

মানুষ। কুসুমপুরেরই।

কিন্তু আপনাকে কুসুমপুরে কখনও দেখিনি।

সে আমারই অপরাধ। বরাবর বাইরে ছিলুম কি না।

উত্তরা ইঞ্জিনের ঢাকনা তুলল। কোনো কথা বলল না।

কী বুঝছেন? ঠেলে দেবো?

উত্তরা ফুঁসতে থাকল। সন্ধ্যা হল বলে। গাড়ি কিছুতেই স্টার্ট নিল না। উত্তরা এদিক-ওদিক তাকাল হতাশ মুখে।

একটু পরেই দেখা গেল কয়েকজন লোক দৌড়ে আসছে সামনে। উত্তরা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু লোকগুলো কাছে এসেই কপালে হাত ঠেকিয়ে ফেলল। তারপর কোনো কথা না বলে গাড়ি ঠেলতে শুরু করল। ব্যাপার কী?

হুঁ, সেই সাইকেলওয়ালার আয়োজন! স্টার্ট নিতেই পার্স খুলে কিছু খুচরো বের করল সে। মুখ বাড়িয়ে বলল, এই, শোনো তোমরা। বখশিস নাও। লোকগুলো কপালে হাত ঠেকিয়ে সমস্বরে বলে উঠল, আজ্ঞে না দিদি! আপনি চৌধুরিবাড়ির মেয়ে। তা কি পারি! একজন বলল, বাবামশাইকে বলবেন, মোহনপুরের নীলুর সঙ্গে দেখা হল। কাল যাবো ওঁর কাছে।

কুসুমপুরে ঢোকার মুখে শেষ বাঁকে দেখা হল আবার সেই সাইকেলওয়ালার সঙ্গে। রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানছে। একটু হেসে তাকাল সে। উত্তরা মুখ বাড়িয়ে এবং এক মুহূর্তের জন্য গতি কমিয়ে বলে গেল, ধন্যবাদ!

ততক্ষণে ওর ম্যাজিকটা সে টের পেয়ে গেছে। রাস্তা এসেছে বাঁক ঘুরে-ঘুরে, কিন্তু এক বাঁক থেকে অন্য বাঁক পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত পথ আছে, যা নিছক পায়ে চলার পথ। কাজেই গাড়ি যত জোরেই যাক, ওই শর্টকাটে সাইকেলের পক্ষে অনবরত এগিয়ে থাকা খুবই সহজ। শেষ অব্দি সমস্ত ব্যাপারটা এত উপভোগ্য মনে হল যে উত্তরা সশব্দে হেসে উঠল।

বাজার পেরিয়ে ব্লক অফিস। তারপর ঘোরালো রাস্তায় কিছুটা এগোলেই চৌধুরিদের সন্ধ্যানীড়। দাদুর দেওয়া নাম। তার পিছনে বাবার ফার্ম।

গেটে ঢুকে বাঁদিকে গ্যারেজ। উত্তরা নামতেই হারাধন নামে পুরোনো চাকর দৌড়ে এলো।—দিদি যে! হঠাৎ!

বাবা কোথায় হারাধনদা?

আছেন। মুর্গির ঘরে।

মুর্গির ঘরে মানে? ওখানে কী করছেন?

আবার কী? ডিমে তা দিচ্ছেন গো! এসো, এসো! দেখবে এসো।

উত্তরা অবাক হয়ে বলল, কী সব বলছ হারাধনদা?

গোকুলবাবু নামে কর্মচারী ভদ্রলোক পিছন থেকে জানালেন, নতুন মেসিন এনেছেন বাবুমশায়। তা দেওয়া মেসিন।

উত্তরা বাড়ির পিছন ঘুরে ফার্মে ঢুকল। তারপর দেখল দীননাথ একটা লোককে নিয়ে ডিম গুনছেন। বারবার ভুল হচ্ছে। আবার গুনছেন এবং লোকটাকে প্রচণ্ড ধমক দিচ্ছেন।

দীননাথ হঠাৎ উত্তরাকে দেখে অবাক হয়েছিলেন। উত্তরা বললেই পারত—এমনি চলে এলুম। কিন্তু মায়ের গোঁ নিয়ে মনে একটু উদ্বেগ ছিল। তাই সোজা বলে দিল, গিয়ে দেখো, মা হাঙ্গার-স্ট্রাইক করে বসে আছে! অমনি দীননাথ সেই সন্ধ্যাতেই বেরিয়ে পড়েছেন। নিজে ড্রাইভ করতে পারেন। গাড়ি নিয়েই গেছেন। এবং বলে গেছেন, তুই চুপচাপ এখানে থেকে যা। একটা এস্পার ওস্পার না করে ফিরে আসছি না এবার। তেমন দেখলে বাড়িসুদ্ধ বেচে দিয়েই আসব, তবে আমি চৌধুরি বংশের ছেলে, হ্যাঁ।

থাক গে, যা হবার হবে। রাতটা অন্তত নিশ্চিন্তে কাটানো যাবে। হারাধন বড্ড গপ্পবাগীশ। অদ্ভুত সব ভুতুড়ে গল্প জানে। সে স্বচক্ষে কতবার ভূত দেখেছে এবং ভূতের পাল্লায় পড়ে মরতে-মরতে বেঁচে গেছে, তার সংখ্যা নেই।

আর এই গোকুলবাবু লোকটি মন্দ নয়। সাদাসিধে মানুষ ঢোল পাতলুন, মাথায় শোলার টুপি—তাবড় গোঁফ, দেখতে অদ্ভুত। খুব বিশ্বাসী কর্মচারী। জমিদারী আমলে কিছুদিন গোমস্তা ছিলেন। এখন ফার্ম দেখাশোনা করেন। নিজেকে উনি ম্যানেজার বলেই জানান সব সময়। ভদ্রলোকের তিনকুলে কেউ নেই।

উত্তরা দেখেছে, গোকুলবাবুর শখ কাঁধে বা টুপির ওপর, কখনও হাতের কব্জিতে সেকেলে মোগল রাজপুরুষদের বাজপাখি নিয়ে বেড়ানোর মতোই প্রকাণ্ড এক লেগহর্ন নিয়ে বেড়ান। মোরগটা প্রায় বাজের মতোই ভয়ঙ্কর। গায়ে

সোনালি পালক, মাথার লাল ঝুঁটিটাও প্রকাণ্ড, কী বাজখাঁই গলায় চেঁচায়! উত্তরার অ্যালার্জি আছে মুরগীর ব্যাপারে। মোরগটার নাম চেঙ্গিস খাঁ এবং তাকে দেখলেই সে নার্ভাস হয়ে পড়ে। পোলট্রির দিকে পারতপক্ষে সে পা বাড়ায় না। বাড়িটা দোতলা। মেরামত করে ঠিকঠাক রাখা হয়েছে। চারদিকে গাছ-পালা ফুল ফলের বাগান আছে। উত্তরার মনে পড়ে ছেলেবেলায় কিছু মার্বেল পাথরের পরীমূর্তিও ছিল বাগানে। বিদেশি ফুল ফলের গাছ ছিল। একটা বর্মী বাঁশের ঝাড় ছিল। এখন সেগুলো নেই। অল্প কিছু দেশী ফুল ফলের গাছপালা আছে—বাকি সব্জীক্ষেত। দক্ষিণের পাঁচিলের লাগোয়া টিনের শেডে মালী পরিবার থাকে। নবচরণ, তার বউ আর তাদের দুটো ছেলেমেয়ে। মালীবউ ভারি সুন্দর কুলের আচার তৈরি করে। মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দেয় শহরের বাড়িতে।

এলাকায় প্রকৃতি নিজের সবকিছু সুন্দর জিনিস মুঠো মুঠো ছড়িয়ে রেখেছে। উত্তরার ভালোই লাগে। তবে খুব বেশিদিন নয়। তারপর এক সময় নির্জনতা আর নৈঃশব্দ্য তার অসহ্য লাগে। তখন কলকাতা ফিরে যায়।

সবচেয়ে সুন্দর লাগে ফার্মের জমির শেষে গঙ্গা। এদিকটায় চর পড়েছে গ্রীষ্মে, ওদিকে ভাঙন। খাড়া পাড় দেখা যায়। তার ওপর বিস্তৃত বাঁশবন। এপারে ঘাটে নামার একফালি পথ আছে। দুধারে ঝোপঝাড় আছে। মড়ার মাথা পড়ে থাকে। একটা বিশাল শিমুল গাছ আছে। শকুনের আড্ডা। অনেক রাতে সেখানে শকুনছানার কান্না শুনে ভয় পেতে হয়। রাতটা গভীর ঘুমে কেটেছিল উত্তরার। এটা দাদুর ঘর। আলমারি ভর্তি প্রচুর বই আছে। মস্ত সেকেলে খাট আছে। টেবিলে ফার্মিংয়ের পত্র-পত্রিকা আর বইয়ের গাদা। বাবা পড়েন।

হারাধন পাশের ঘরে শোয়। সে ভীতু মানুষ। গোকুলবাবু আজ বারান্দায় ক্যাম্প খাট পেতে শুয়েছিলেন—যেন উত্তরার পাহারায়। রীতিমতো বন্দুক পাশে নিয়েই শুয়ে ছিলেন। সেবারকার মতো আচমকা রাতদুপুরে ফাঁকা আওয়াজ করেননি, এই যা। ভদ্রলোক অতিমাত্রায় সতর্ক। একটু আওয়াজ পেলেই জোরালো টর্চ জ্বেলে প্রচণ্ড চেঁচাবেন—হু ইজ দেয়ার? ভাগ্যিস, এবার তেমন কিছু ঘটল না।

সকালে চা খেয়ে উত্তরা ফার্মে ঢুকল। নদীর ধারে ঘুরে আসবে অভ্যাসমতো। হারাধন বলল, নেলোটাকে নিয়ে যাও, দিদি। একা বেড়িও না। দিন কালের গতিক ভালো না।

নেলো মানে নলিনী—গাঁয়েরই ছেলে। ফার্মে কাজকর্ম করে। ক্লাস সিক্স

অব্দি পড়ে বাবা মারা যায়, তখন পেটের দায়ে এখানে-ওখানে ঘুরতে থাকে। সম্প্রতি দীননাথ তাকে জুটিয়েছেন। একটা শর্ত—প্রাইভেটে পরীক্ষা দিতে হবে। তাই অবসর সময়ে পড়াশোনায় বসতে হবে। রাতে শোবার পর উত্তরা তার চেঁচামেচি করে পড়া মুখস্থ শুনতে পাচ্ছিল। নীচের একটা ঘরে সে থাকে। তার মা এবং আর ভাইবোন গ্রামের মধ্যে থাকে।

এমন সব পোষ্য রাখা চৌধুরিবাড়ির ট্র্যাডিশন। শহরের বাড়িতেও তেমনি সব আছেই। এর মধ্যে মানবতা কতটা আছে উত্তরা বোঝে না—বোঝে এটা একটা পারিবারিক মর্যাদার সেকেলে ধারণা।

নেলো ছেলেটি কিন্তু ভারি লাজুক আর অনুগত। উত্তরার ভালোই লাগে। সকালে বেরোতে গিয়ে তাই তাকে খুঁজল। নেলো নেই—গোকুলবাবুর সঙ্গে বাজারে গেছে। তখন উত্তরা একা একা এগোলো। প্রথমে গেল নবচরণ মালীর ঘরে।

মালীবউয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে সে সব্জীক্ষেতে ঢুকল। কিছুটা যাওয়ার পর আচম্বিতে এক কাণ্ড ঘটে গেল।

কোত্থেকে সেই লেগ হর্ন মোরগটা উড়ে এসে উত্তরার মাথায় বসল। সেইসঙ্গে বিকট চেঁচানি। উত্তরা ব্যাপারটা টের পেয়েই ভয়ার্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। মোরগটা ঝেড়ে ফেলার জন্য যথাসাধ্য নাচানাচি করল সে। কিন্তু নখ আটকে গেছে চুলের সঙ্গে। কিছুতেই ছাড়ানো গেল না। ওই অবস্থায় দিশেহারা হয়ে উত্তরা দৌড়ল। কোথায় যাচ্ছে, নিজেও জানে না। ফার্মের জমি ঢালু হয়ে যেখানে নেমেছে, সেখানে একটা বালির চড়া আছে। সেখানে আছাড় খেয়ে পড়ল উত্তরা। মোরগটাও ঝটপট করে ডানা নাড়ছে। সেও নিশ্চয় ভয় পেয়েছে। চুল থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারছে না। বালিতে দুজনেই গড়াচ্ছে। দূরে কোথায় গোকুলবাবুর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, চেঙ্গিস খাঁ! অ্যাই ব্যাটা গাড়োল কাঁহেকা!

এই সময় হঠাৎ চেঙ্গিস খাঁ শেষ ডাক ছেড়ে ফর ফর করে ডানা নেড়ে চলে গেল। তখন উত্তরা চোখ খুলল। তার গায়ে ছায়া পড়েছে কার। গোকুলবাবু নিশ্চয়। উনিই উদ্ধার করলেন, আবার কার সাধ্য। কিন্তু গোকুলবাবুকে দেখা যাচ্ছিল উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তার হাতে গিয়ে বসেছে চেঙ্গিস খাঁ। জোর ধমক দিচ্ছেন ওকে।

উত্তরা হুড়মুড় করে উঠে বসল। তারপর হতভম্ব। শুধু হতভম্ব নয়, অপ্রস্তুত, লজ্জিত এবং ক্রুদ্ধও। সেই সাইকেলওয়ালা!

তবে এবার সঙ্গে সাইকেল নেই। কাঁধে ঝোলা নেই। পাঞ্জাবির বদলে প্যান্টশার্ট, তবে যথারীতি যত্নের অভাব। উত্তরা আর তাকালো না, হনহন করে ঘাটের পথ বেয়ে উঠতে থাকল।

গোকুলবাবু ডাকছিলেন, হ্যাল্লো অরুণ!

এই যে গোকুলদা! আসুন, সিগ্রেট খাওয়া যাক।

উত্তরা গোকুলবাবুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, আপনার চেঙ্গিস খাঁয়ের পায়ে শেকল পরান না কেন গোকুলকাকা? বড্ড অদ্ভুত তো!

গোকুলবাবু জিভ কেটে বললেন, ব্যাটাকে সত্যি শেকল পরাতে হবে মা। ইউ আর রাইট। আসলে কি জানো, কারও-কারও কাঁধে চাপতে ওর ভালোই লাগে! সেই অট্টুকন থেকে পুষছি। ট্রেনিং দিয়েছি। মাইন্ড দ্যাট, এ কিন্তু তোমার ফাদার্স প্রপার্টি নয়! অ্যাবসোলিউটলি মাইন!

গোকুলবাবু হেসে উঠলেন। উত্তরা এগিয়ে গিয়ে ফার্মের গেটে ঢুকল। সকালের সব আনন্দ মারা গেল আজ। বাবা এসে পড়লেই কেটে পড়তে হবে।

ক'পা এগিয়ে সে ঝোপের আড়ালে দাঁড়ালো। সেই অরুণকে দেখার জন্যে। কে ও? কী করে? সামান্য কৌতূহল মাত্র।

অরুণ আর গোকুলবাবু সিগ্রেট ধরিয়েছেন ওদিকে। দুজনে খুব হাসাহাসি হচ্ছে, হয়ত উত্তরাকে নিয়েই। উত্তরার রাগ হল। ওরা কথা বলতে বলতে ফার্মের দিকে আসছে। উত্তরা আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল।

তা যাই বল অরুণ, নন-ভেজিটারিয়ানরাও কিন্তু আসলে ভেজিটারিয়ান। বল, সত্যি কি না? যেমন আমি। মাংস খাই, আবার শাকসব্জীও খাই। কিন্তু বাবুমশাই? মাংস তো ছোঁবেন না, পেঁয়াজ পর্যন্ত না। আচ্ছা অরুণ, পেঁয়াজ কেন আমিষ, আজও বুঝলুম না! সেকালে শাস্ত্রকাররা রিয়্যালি কি ডেঞ্জারাস লোক ছিলেন। পেঁয়াজ আমিষ! মাই গড!

চৌধুরীমশাই নিরামিষভোজী হয়েও পোলট্রি করলেন কেন বলুন তো গোকুলদা?

জাস্ট বিজনেস!

উত্তরা মনে মনে বলল, খুব চিনেছ গোকুলকাকা। বাবার আসলে এটা হবি। বাবা বিজনেসে পয়সা কামাবেন, তাহলেই হয়েছে।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, স্রেফ আমিষের লোভে আপনার চাকরি গোকুলদা! গোকুলবাবু যেই জোরে হেসেছেন, চেঙ্গিস খাঁ সম্ভবত চমকে গিয়েই বিকট চেঁচিয়ে আবার উড়ল। গোকুলবাবু বলে উঠলেন, চেঙ্গিস! চেঙ্গিস খাঁ! বলে সব্জীক্ষেতের মধ্যে মাচান ও ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে দৌড়লেন।

অরুণ একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ বাঁদিকে, যেদিকে উত্তরা আছে, ঘুরল। তারপর একটু হেসে বলল, আপনার বাবার বিরুদ্ধে আশা করি তেমন কিছু বলিনি। তাই না? এবার দয়া করে বেরিয়ে আসুন।

আশ্চর্য ধুরন্ধর মানুষ তো! ঠিক দেখতে পেয়েছে! উত্তরা তবু নড়ল না। একটু বাঁকা হেসে বলল, আমি কারুর ওপর গোয়েন্দাগিরি করিনি। বরং আপনিই করছেন, তাই...

বলুন, বলুন!

তাই কাল থেকে পেছনে লেগে আছেন।

উঁহু সামনে থেকে। কাল বরাবরই সামনেই ছিলুম। এর মধ্যে ভুলে গেলেন?

মধ্যে ঝোপের আড়াল আছে, দুপাশ থেকে দুজন কথা বলছে।

উত্তর বলে উঠল, কিন্তু লেগে থাকার কারণ কী?

ওটা নিতান্ত অ্যাকসিডেন্ট! তবে এখনকারটা খুব সাংঘাতিক নিশ্চয়! যাক গে, সরে দাঁড়ান। একটা সবুজ রঙের সাপ যাচ্ছে!

উত্তরা চমকে উঠে সত্যি সত্যি সাপটাকে দেখতে পেল। কী সর্বনাশ! বরাবর এসে কিছু সময় ভুলে যায় যে—এলাকায় প্রচুর সাপ আছে! ফার্মে কতবার কত মারা পড়ে তার সংখ্যা নেই। সে দ্রুত সরে এক ফালি রাস্তাটায় গেল এবং অরুণের মুখোমুখি হল। তখন দেখল, অরুণ মিটিমিটি হাসছে।

এ হাসির কী মানে থাকতে পারে উত্তরা বুঝল না। একবার তাকিয়েই দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল এবং বাগান লক্ষ্য করে পা বাড়াল। অবশ্য লেগ হর্ন চেঙ্গিস খাঁ ওদিকেই উড়ে গেছে। কিন্তু এবার তার পিছনে গোকুলবাবু আছেন। আশ্চর্য আশ্চর্য এবং পরমাশ্চর্য! আমাকে এখনও চিনতে পারলে না লালী!

পলকে উত্তরা ঘুরে দাঁড়াল। লালী! লালী তো তার ছেলেবেলায় ডাকনাম ছিল। দাদুর দেওয়া নাম। তাই কুসুমপুরে এলে এখানকার সবাই তাকে লালী বলে ডাকত। দাদু মারা গেলে দীননাথ যাতায়াত একেবারে কমিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়িটা প্রায় পোড়ো হয়ে উঠেছিল। আর উত্তরাও ততদিনে যথেষ্ট বড় হয়ে উঠেছে। কালক্রমে ওই ডাকনামটা উঠেই গেল। মা তো ডাকতেনই না ও নামে, দাদুকে তিনি পছন্দ করতেন না কোনো কারণে। বাবা কদাচিৎ যেন ঘুমের ঘোরেই ডাকেন এবং স্ত্রীর ভয়ে তক্ষুনি সেটা আড়াল করেও ফেলে। ফলে উত্তরা নিজেই ডাকনামটা ভুলে গেছে। এখন মনে পড়লে ওটা অচেনা লাগে।

কিন্তু 'লালী' এবং 'চিনতে পারলে না' বলছে অরুণ নামে এই লোকটা বা যুবকটা—উত্তরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। এতক্ষণে একবার মনে হচ্ছে, চেনা, আবার মনে হচ্ছে অচেনা। হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যায়ও একবার মুহূর্তের জন্যে এমন লেগেছিল বটে।

আমি নোটন। এবার চিনেছ তো? বাঁড়ুয্যে বাড়ির নোটন।

তক্ষুণি উত্তরা চিনল। হ্যাঁ, নোটন। ওপাশে এমনি একটা দোতলা বাড়ি আছে বাঁড়ুয্যে বাড়ি। দু-বাড়ির মধ্যে একটা ফাঁকা জমি। সেখানে গাঁয়ের ছেলেরা শীতের সময় ব্যাডমিন্টন বা ক্রিকেট খেলে। ওই জমি নিয়ে দুই পরিবারে এক সময় নাকি প্রচণ্ড মামলা-মোকদ্দমা চলেছিল। উত্তরার দাদুর মৃত্যুর পর দীননাথ সেটা মিটিয়ে নেন। গ্রামে থাকার মতলব তাঁর ছিল না। আর, বাঁড়ুয্যেদের একটা বিশালাকায় অ্যালশেসিয়ান ছিল। ওই জমিতে সেটা নিয়ে খেলা করত এই নোটন। একদিন কুকুরটা উত্তরার ফ্রক কামড়ে টানতে টানতে নোটনের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। উত্তরার সে কী কান্না!

মুহূর্তে আরও কিছু টুকরো-টাকরা স্মৃতি উত্তরার মাথায় ভেসে এলো। নদীর ওপারে গিয়ে একবার পিকনিক করেছিল। নোটনের প্ররোচনায়। দাদু জানলে রক্ষে ছিল না। ছেলেটা ভারি অদ্ভুত ছিল মনে পড়ে। বেশ খানিকটা বন্য স্বভাব। গোঁয়ার। বর্ষায় একবার ভরা গঙ্গা পেরিয়ে লোককে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

উত্তরা দক্ষিণের জানালায় বসে ওপর থেকে লক্ষ্য রাখত, কখন ও বাড়ির নোটন কোন কীর্তি করছে দেখবে। কিছু দক্ষিণে শ্মশান আছে। বিরাট বটগাছ আছে সেখানে। এক কৌপিনধারী সাধুকে বসে থাকতে দেখা যেত। নোটনের সঙ্গে লুকিয়ে একবার দেখে এসেছিল। তখন ওর ক্লাস সেভেন বা এইট—উত্তরা ফাইভ সম্ভবত। পরীক্ষার বরাত জানতে গিয়েছিল নোটন। সাধু ছিল মৌনীবাবা। মাটিতে একটা গোল্লা এঁকে দিয়েছিল পোড়াকাঠের কালিতে। নোটন আড়াল করে নাকি ঢিল ছুড়ে তাকে বটতলা থেকে তাড়ায়।

সেই নোটন! কিন্তু আশ্চর্য, কেউ কেউ বড় হয়ে এত বেশি বদলায়, ভাবা যায় না। সে উত্তরাকে চিনেছে, নিশ্চয় দেখামাত্র চিনেছিল গতকাল, এবং তারপর থেকে তাই যথেষ্ট মজা করছে, উত্তরা তাকে চিনতে পারেনি। এর মানে, উত্তরা বিশেষ বদলায়নি চেহারায়।

কী? তবু চিনতে পারছ না? আশ্চর্য মেয়ে রে বাবা!

উত্তরা এতক্ষণ শান্তভাবে একটু হাসল। মাথাটা সামান্য দোলাল। কোনো কিছুতে উচ্ছ্বাস দেখানো তার স্বভাব নয়।

অরুণ পা বাড়িয়ে বলল, এখানে এলেই তুমি অন্তত একবার গঙ্গার ধারে আসবে, জানতুম। তবে এভাবে তোমাকে খাঁ সাহেবের হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে, নিশ্চয় ভাবিনি। বরং আমার প্ল্যান ছিল, ঠিক সেবারকার মতো কোনো একটা ঝোপে লুকিয়ে থেকে একটুখানি ভয় দেখাবো! আসলে আমি হয়ত এখনও মনে মনে বড্ড খোকা হয়ে আছি!

উত্তরা বলল, তোমার নাম অরুণ, জানতুম না।

জানতে। ভুলে গেছ। বলে হঠাৎ একটু গম্ভীর ভাবে কী ভাবল। আবার বলল, কিন্তু হঠাৎ তুমি-টুমি শুরু করলুম, এতে নিশ্চয় তুমি আপত্তি করছ না?

কেন?

আফটার অল তুমি এখন পরিপূর্ণ মহিলা, এ ফুল-সাইজড লেডি।

উত্তরা পা বাড়িয়ে বলল, তুমি বাইরে কোথায় থাকতে যেন?

হ্যাঁ। জব্বলপুরে, মামার ওখানে। মাস ছয়েক হল এসেছি। ভাল্লাগে না আর।

উত্তরদিকে অনেকদূর অব্দি বেড়া ঘেরা জমি—বোরো ধান লাগানো হয়েছে। কোথাও দু-একটা গাছ, বাদবাকি ফাঁকা। গঙ্গা থেকে পাম্পে জল তোলা হচ্ছে। দীননাথ কবে চাষবাসে এতটা মন দিয়েছেন, উত্তরা টের পায়নি। সেদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে সে বলল, এখানে এসে কী করছ? বাবার মতো চাষবাস নিয়ে আছ নাকি?

অরুণ সিগ্রেট বের করে বাতাস বাঁচিয়ে ধরাল। তারপর বলল, নাঃ ডাক্তারী করব ভাবছি।

ডাক্তারী! উত্তরা অবাক হল।

হ্যাঁ। জব্বলপুরে সরকারি হাসপাতালে বছর দুই ছিলুম। তারপর মামা বললেন চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিসে নামো। এখানে বস্তী এলাকায় ভালো পসার জমাবার স্কোপও হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ মা মারা গেলেন। চলে এলুম কুসুমপুরে।

উত্তরা হেসে বলল, কিন্তু তোমাকে দেখেই ভাবাই যায় না যে তুমি ডাক্তার!

কেন? বলেই অরুণ হেসে উঠল।—বুঝেছি! স্মার্ট দেখাচ্ছে না।

হ্যাঁ। তোমাকে কাল তো...

অরুণ কথা কেড়ে বলল, এলাকার পাটের কারবারী মনে হচ্ছিল?

কতকটা!

এই সময় গোকুলবাবুকে দেখা গেল, যথারীতি হাতে চেঙ্গিস খাঁ! হাত নেড়ে ডাকছিলেন বাগানের ধার থেকে।—হ্যাল্লো অরুণ! উত্তরা! কাম হেয়ার! উত্তরা

ইতস্তত করছিল, অরুণ বলল, তোমার মাথা বাঁচাবার ভার আমার। চলো, গোকুলকাকার মাথার ওপর প্রচুর আম পেকেছে দেখতে পাচ্ছি। আমার নোলায় জল আসছে। তোমার আসছে না?

অরুণ সেই নোটনই আছে! ওর জীবনটা যেন চিরবর্তমান। উত্তরাই বদলেছে—উত্তরা তীব্র একটা নিঃশ্বাস রোধ করতে পারল না, বেরিয়ে গেল। হয়ত ছেলেবেলাটাই জীবনের সুখী বা অসুখী হওয়ার পথ বাতলে দেয়।

দেখেই গোকুলবাবু বললেন, ইয়ে উত্তরা, আলাপ করিয়ে দিই...

অরুণ বলল, দরকার হবে না। কারণ এতক্ষণ আমরা আলাপই করছিলুম। গোকুলবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, তাই বুঝি? আমি ভাবলুম তোমরা নিশ্চয় অপরিচিতের মতো ঝগড়া করছ। সুতরাং তোমাদের ডেকে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে পৌঁছে দেবার কথা ভাবলুম।

তারপর হাসির ধুম পড়ে গেল।...

দীননাথ বিকেলে ফিরলেন। রেগে একেবারে গুম। বোঝা গেল, ক্ষমা একেবারে পাত্তা দেননি। কিন্তু সমঝোতা করতে গিয়ে দীননাথ গাড়িটি খুইয়ে ফিরেছেন। বললেন, আশ্চর্য কাণ্ড তোর মায়ের। বসিয়ে রেখে বেরোলো বিপিনকে নিয়ে। কথা দিল, ফিরে এসে আমার সঙ্গে কুসুমপুরে চলে আসবে। ব্যস! তারপর সেই শেষ দেখা। বসে আছি তো আছিই! শেষে বললেন, আমিও তেমনি ওর ঘরের দরজা লক করে এসেছি। ননী-ঠাকরুনের হাতে সব উচ্ছন্নে যাক্ আর কী! যে চুলোয় যাক, ফিরতে তো হবেই, ফিরে দেখবে দরজা বন্ধ। তখন বুঝবে ঠ্যালাটা!

উত্তরা মনে মনে বলল, কোনো ঠ্যালা নয়। চাবিওলা ডেকে সেবারকার মতো তালা খোলাবে। সে বাবাকে সায় দিয়ে প্রকাশ্যে বলল, খুব ভালো করেছ। মা থাক ওখানে, আমরা আর কলকাতা ফিরছিনে। কেমন বাবা?

দীননাথ সোৎসাহে বললেন, অবশ্য, অবশ্য! আমি তোকে বারবার বলছি না? এখানে লাইফ আছে। খাঁটি লাইফ। কয়েকটা দিন যেতে দে, দেখবি আরও আরও কী সব এলাহি কারবার করি। ডেয়ারিসুদ্ধ খুলব। পঞ্চাশটা দুধেল গাই কিনব। মিল্ক প্রোডাক্টসের প্রচণ্ড চাহিদা আছে দেশে। তবে ওই গোকুলটার ম্যানেজমেন্টে কিস্যু হবে না! একপুকুর মাছের পোনা ছেড়ে গেলুম গত বর্ষায়, এবার এসে দেখি জলসুদ্ধ লোপাট! মিরাকল! চোর—সব চোর! কারুর ওপর নির্ভর করা যায় না।

এই ফাঁকে উত্তরা বলল, আচ্ছা বাবা বাঁড়ুয্যেবাড়ির সেই নোটনকে মনে পড়ে তোমার? রোগা ফর্সামতো ছেলেটা—বড্ড পাজিটাইপ ছিল!

কথা কেড়ে নিয়ে দীননাথ হেসে বললেন, হ্যাঁ, ও তো এখন ডাক্তার। ডিসপেন্সারি খুলতে চায় এখানে। বাইরে কোথায় থাকত এতদিন। এসেছিল নাকি?

উত্তরা মাথা দোলাল।

এখনও আমায় যা ভয় করে! কবে ছেলেবেলায় একবার তাড়া খেয়েছিল এখনও সে ভয় যায়নি। বলেই দীননাথ খুব হাসতে লাগলেন।

উত্তরা বলল, ভয় যায়নি মানে?

অনেকদিন হল ফিরেছে। অথচ আমার মুখোমুখি হল না আজও। লোকের কাছে ওর কথা শুনি। ডেকে পাঠিয়েছি—আসে না। অদ্ভুত ছেলে!

উত্তরা গম্ভীর মুখে বলল, এমনও হতে পারে, ওদের সঙ্গে মামলা করেছিলে, তাই এখনও শত্রু ভাবে।

দীননাথ জোরে মাথা দোলালেন।—অসম্ভব! অবিশ্বাস্য! কীসের মামলা? মামলা তো আমিই তুলে নিয়ে মিটমাট করেছিলুম। কিন্তু সে ওর বাবার আমলে। তখন তো ও নেহাৎ বাচ্চা।

উত্তরা বলল, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

তাই বুঝি? বলেই দীননাথ হঠাৎ দৌড়লেন।—রাঘব! জগন্নাথ! গোকুলবাবু! এসেছে—এসেছে!

উত্তরা অবাক। দীননাথ ফার্মের দিকে দৌড়চ্ছেন। সে বাগানের দিকে হন্তদন্ত এগোলো। তারপর দেখল সব্জী ক্ষেতের আড়ালে ব্যাপারটা দেখা গেল না। একটু পরেই বন্দুকের শব্দ হল।

হারাধন এসে জানালো, শেয়াল।

উত্তরা ভুরু কুঁচকে তাকাল।

হারাধন একগাল হেসে বলল, শেয়াল গো, ভুঁড়শেয়ালী যাকে বলে! ইয়া গাব্দাগোব্দা চেহারা! বড্ড বাড় বেড়েছে ব্যাটার। মানুষজনের ডর নেই! সবসময় ওৎ পেতে থাকে মুরগীর খাঁচার তলায়। বাবুমশায়ের নজর ইদিকে বড্ড কড়া।

উত্তরা বলল, কুকুর পুষলেই তো হয়। যা চ্যাঁচামেচি করার, সে-ই করবে। হারাধন বিমর্ষ মুখে বলল, আরে কাণ্ড! তাও জানো না? তিন-তিনবার তিন-তিনটে কুকুর আনা হল। সবগুলো রাতারাতি মারা পড়ল। গোকুলবাবু

বললেন, সাপের কামড়ে। আমার মনে হয়, কোনো ব্যাপার আছে এর পেছনে! প্রায়ই গাদা গাদা ডিম চুরি মুরগী চুরি লেগেই আছে। বুঝলে দিদি, চোর আমাদের ঘরেই আছে। কুকুর রাখলে বিষ দিয়ে মেরে ফেলে। বাবুমশাই শেষ পর্যন্ত তাই বললেন, থাক, আর কুকুর হত্যা করে পাপ বাড়াব না। বরং কড়া পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে।

একটু পরে দীননাথ ফিরলেন সদলবলে। শেয়ালটা দেখেছিলেন, তাতে কোনো ভুল নেই। নন্দীদের বাগানের দিকে পালিয়েছে।

তাহলে দীননাথ এখানে এসব অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার নিয়ে থাকেন! উত্তরা মনে মনে প্রচুর হাসল। কলকাতায় দীননাথের সঙ্গে কুসুমপুরের দীননাথের প্রচণ্ড একটা ফারাক এবারে এসে বেশ স্পষ্ট হয়ে উত্তরার চোখে ফুটে উঠেছে। কাঞ্চন গাছের গোড়ায় গোলাকার সিমেন্টের চত্বরে দীননাথের পরামর্শ সভা বসেছে। গোকুলবাবুর মতে, চোর থিওরি ভুল, বাবুমশায়ের শেয়াল থিওরিই কারেক্ট। কুকুর প্রসঙ্গও উঠেছে। রাঘবের মতে, দেশী কুত্তা চলবে না। বিলিতি কুত্তা আনা হোক। নন্দীবাড়িতে ঠিক এমনি কাণ্ড হত। শেষে ডালকুত্তা আনায় সব ঠাণ্ডা হয়েছে। পাঁচিলের বাইরে জনপ্রাণীটি গেলেই জোড়া ডালকুত্তা গরগর করে ওঠে। আর নন্দীদের বাগানে ফুল চুরি হচ্ছে? শুনেছে কেউ? কেউ শোনে না। জগন্নাথ বলল, উঁহু। ডালকুত্তা বড় রাক্ষুসে। মানুষও খায়। সুতরাং অ্যালসেশিয়ান আনা হোক। বাবুমশায়, বাড়ুয্যেদের সেই অ্যালসেশিয়ানটার কথা মনে আছে আপনার?

উত্তরা বেরোলো।

গেট পেরিয়ে ডাইনে, দক্ষিণে ঘুরল। পূর্বে ঘন গাছপালা ঘেরা একটা পুকুর। রাস্তাটা নির্জন। বিকেলের শান্ত রোদ খেলছে দূরের মাঠে। সন্ধ্যানীড়ের পাঁচিলের দীর্ঘ সীমানা পেরিয়ে সেই পুরোনো বিতর্কিত ফাঁকা জমি। জমিটা এখনও তেমনি আছে, সবুজ ঘাসে ঢাকা। আর বোধহয় খেলাধুলো হয় না ওখানে। কুসুমপুর এখন গ্রামনগরী। ব্লকের ওদিকে বড় মাঠ হয়েছে খেলার। এদিকটা জনবিরল। পোড়ো ভিটের জঙ্গলে ভরা। প্রকৃতির করতলগত সবটাই। ফাঁকা জমিটার দক্ষিণে বাঁড়ুয্যেবাড়ি এখনও দাঁড়িয়ে আছে তেমনি সংহত চেহারায়, কিন্তু ফাটল ধরেছে কার্নিসে। বটের চারা গজিয়েছে। দেওয়ালের উপর সবুজ বা কালো শ্যাওলার জমাট পোঁচ।

একটু ইতস্তত করে সে বারান্দায় উঠে গেল। এই বারান্দায় ইজিজেয়ারে বসে তামাক খেতো অরুণের ঠাকুরদা। মনে হল লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ইয়াব্বড় সাদা গোঁফ, মাথায় লম্বা চুল, খালি গায়ে ধবধবে পৈতে

জড়ানো, পায়ের কাছে খড়ম, পাশে ফরাসি হুঁকো। যেন এক্ষুণি গরগর করে উঠবেন, অ্যাই, কে রে?

ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। কড়া নাড়ল সে। কয়েকবার নেড়েও কোনো সাড়া নেই। বাড়িটা যেন নির্জনতা ও স্তব্ধতার মধ্যে ডুবে আছে। এত বড় বাড়িতে অরুণ একা থাকে!

উত্তরা ভাবল, ফিরে যাবে। পা তুলতেই কিন্তু হুট করে দরজা খুলে গেল।

অরুণ বলল, আরে। লালী যে! এসো, এসো।

অরুণের মুখে ঘাম। কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ওকে।

উত্তরা হাসতে হাসতে বলল, চলে এলুম! ভাবলুম, বাঁড়ুয্যেবাড়ির নটি বয় কী করছে, দেখে আসি। নিশ্চয় কোনো দুষ্টুমির প্ল্যান আঁটছিলে বসে?

অরুণ কেমন যেন অপ্রস্তুত হাসল। না। মানে...এসো। এক মিনিট, আলো জ্বেলে দিই। এ ঘরেই বসো।

আলো জ্বালাল সুইচ টিপে। ঘরটা বড়। সেকেলে আসবাব আছে। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। একটা প্রকাণ্ড গদি-আঁটা চেয়ারে উত্তরা বসে পড়ল।

অরুণ বলল, তেমন লোকটোক পেলুম না। বাড়িসুদ্ধ জঞ্জালে ভর্তি হয়ে আছে। মাঝে মাঝে নিজেই হাত লাগাচ্ছি। তোমার নিশ্চয় গরম লাগছে। দাঁড়াও, ও ঘর থেকে টেবিল ফ্যানটা এনে দিচ্ছি।

উত্তরা বলল, না, থাক।

অরুণ কাঁচুমাচু মুখে একপাশে বসল। সিগ্রেট ধরিয়ে বলল, আসার পর ইলেকট্রিক কানেকশান নিলুম। অনেক কিছু প্ল্যান আছে মাথায়।

উত্তরা মুখ টিপে হাসল।—দুষ্টুমির প্ল্যান নিশ্চয়? বলো, শুনি।

অরুণ হেসে উঠল।—হয়ত তাই। অভ্যাস যাবে কোথায়?...এই রে! তোমাকে আপ্যায়ন করা উচিত। এক মিনিট আসছি।

উত্তরা বাধা দিয়ে বলল, না। আপ্যায়িত হতে আমি আসিনি। এসেছি, স্রেফ পাগলদের হট্টগোল থেকে বাঁচতে। কিন্তু...

কিন্তু এখানে এসেও পাগলের পাল্লায় পড়লে?

পড়েছি।

পড়েছি?

হ্যাঁ। তোমার হাতে এই গ্রীষ্মকালে দস্তানা দেখেই টের পাচ্ছি সেটা। অরুণ দ্রুত দস্তানা দুটো খুলে বলল, কী কাণ্ড!

এতে রক্ত লেগে আছে! কাকে খুন করছিলে শুনি?

রক্ত! মাই গুডনেস! অরুণ লাফিয়ে উঠল।—না, না। রং।

রং! কিসের রং!

বার্নিশের। ওপরের একটা ঘর রং করছিলুম।

লাল রং?

হ্যাঁ। মন্দ কী! জানো গ্রীষ্মে এই লাল রংটাই প্রকৃতির সঙ্গে মানানসই। মাঠের দিকে তাকালেই এর প্রমাণ পাবে। বাই দা বাই, লালী তোমার বাবা তখন ফিরলেন মনে হল। সঙ্গে দেখলুম বিস্তর বোঁচকাবুঁচকি রয়েছে। তোমার মা নিশ্চয় আসেননি?

উত্তরা মাথা দোলাল। তারপর ঘরের দেয়ালে চোখ বুলিয়ে বলল, এই, তোমার দাদুর ছবিটা কোথায়? এ ঘরেই তো ছিল, তাই না? বিরাট ছবি, পুরো দেওয়াল জুড়ে ছিল মনে পড়ছে।

অরুণ গম্ভীর হয়ে বলল, যত সব সেকেলে রুচি! আমি এসেই সেটা পার্টিশানের কাজে লাগিয়েছি। ওদিকের ঘর বড্ড বড়, বাজে দেখাচ্ছিল, তাই—

উত্তরা হেসে ফেলল।—বোঝা যাচ্ছে, আসার পর বাড়ির মধ্যে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করেছ!

এক্সপেরিমেন্ট! না, না। লালী, বরং চা খাওয়া যাক। এমনি-এমনি কথা বলা ভালো দেখায় না। এক মিনিট, আসছি!

সে হন্তদন্ত হয়ে উঠল। উত্তরাও উঠে দাঁড়াল। বলল, চলো, তোমাদের বাড়িটা দেখা যাক। তোমাদের সঙ্গে আমাদের যা ঝগড়া চলত তখন, ঢুকতেই সাহস পেতুম না। তার ওপর তোমার দাদু! যেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার!

অরুণ দাঁড়িয়ে গেল। বলল, তা তুমি ঠিকই বলেছ। অবশ্য, এখন আর এ বনে বাঘ নেই। নির্ভয়ে ঘোরাঘুরি করা যায়। কিন্তু বাড়ি ভর্তি এখন আরশোলার উপদ্রব। দেখ, জাস্ট লুক! নাম করতে করতেই এসে হাজির। বলার সঙ্গে সঙ্গে তার জামার কলারে একটা আরশোলা দেখতে পেল উত্তরা। অমনি সে আঁতকে উঠল। তারপর সভয়ে দেওয়ালের দিকে একবার তাকিয়ে একলাফে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে পৌঁছল।

অরুণ আরশোলাটা কাঁধে নিয়েই এগিয়ে এলো হন্তদন্ত হয়ে।—আরে! কী কাণ্ড! তুমি...তুমি তো বড্ড...লালী! লালী!

উত্তরা বারান্দা থেকে নেমে হনহন করে হাঁটতে শুরু করেছে।

অনেক রাতে বন্দুকের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল উত্তরার। ফার্মের ওদিকে গোলমাল করছে কারা। সে উঠল না। একটু পরে চেঁচামেচি থেমে গেল। তারপর আবার ঘুমে চোখের পাতা জুড়িয়ে এলো। কুসুমপুরে এলেই বারবার ঘুমটা খুব গভীর হয়। সকাল সকাল ওঠা যায়। তারপর গঙ্গার চরে বেড়ানোর মতো আনন্দ আর কিছুতেই নেই।

রাতের হইচইয়ের কারণ আর কিছু নয়, মুরগী চুরি। শেয়াল হতে পারে, আবার মানুষও হতে পারে। কিন্তু গোকুলবাবুর মতে মানুষ। তা না হলে অমন তারের জাল জন্তুর দাঁতে কাটা যায় না। আর প্রত্যেকবারই বেছে বেছে বাচ্চা মুরগী নিয়ে যাবে শেয়াল? অসম্ভব। বিশেষত এই জাতের মুরগী বিশেষ করে একটা বয়সে ভারি উপাদেয়। টেস্টফুল। ব্যাপারটা তাই দাঁড়াচ্ছে যে একবার টেস্ট করেই ভোজনরসিক চোরটাকে নেশায় ধরেছে।

দীননাথের ধমক খেয়ে গোকুলবাবু চুপ করেছেন। দীননাথ ক্ষেপে গিয়ে বলেছেন, আজই ডালকুত্তা, হ্যাঁ খাঁটি বুলডগ নিয়ে তবে ফিরবেন। একটা নয়, একজোড়া। নিউমার্কেটের কাসেম খাঁ'র সঙ্গে একবার কথাও হয়েছিল। সে বলেছিল, আর কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকুন, স্কটল্যান্ড থেকে সরেস জাতের ডালকুত্তা আনিয়ে দিচ্ছি। হারাধন, বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে বলে আয়, সিট রাখবে।

হারাধনকে যেতে হল। এমন সময় গেটে সাইকেল রেখে অরুণ এসে ঢুকল। নমস্কার জ্যাঠামশাই! চিনতে পারছেন! আমি অরুণ, মানে নোটন। দীননাথ লাফিয়ে উঠলেন।—নোটন! কি মুশকিল! একেবারে ডুমুরের ফুলটি হয়ে উঠেছ যে বাবা! বরাবর এসে শুনছি, তুমি কুসুমপুরে এসেছ, ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছ। অথচ দেখা দাও না। ব্যাপার কী বল তো? নাকি সেই মামলা বিসম্বাদের রাগটা তোমাদের নাড়িতে এখনও ঘোচেনি? অরুণ বলল, না, না। কী যে বলেন! সময় পাই না, নানান কাজে ঘুরি। অবশ্য আপনাদের এখানে উঁকি না মেরেছি, এমন নয়। কখনও শুনেছি আপনি ব্যস্ত, কখনও শুনেছি, আপনি এইমাত্র কলকাতা ফিরে গেলেন! ইম্পসিবল! দীননাথ ওর হাত ধরে কাঞ্চনতলার চত্বরে বসালেন। পাশে বসে বললেন, এরা কেউ আমাকে বলেনি যে তুমি আমার খোঁজ করেছ। এই যে দেখছ, এরা সব—প্রত্যেকে আমার সঙ্গে ট্রেচারি করে।

গোকুলবাবু একটু তফাতে দাঁড়িয়ে সযত্নে চেঙ্গিস খাঁয়ের পিঠে ব্রাশ করছিলেন। প্রতিবাদ করে উঠলেন, দিস ইজ অ্যাবসোলিউটলি অ্যাবসার্ড! গোকুল মল্লিক সারা জীবনটাই কাটিয়ে দিলে এ বাড়িতে। বাবুমশাইয়ের বাবামশাইয়ের আমলে ঢুকেছিল, তখন সবে গোঁফ উঠেছে, সেই গোঁফ পেকে ঝুরঝুর করে খসে যাচ্ছে। একটা আধলার কারচুপি হয়নি আজও। দীননাথ দমে গিয়ে বললেন, আহা! তোমায় বলছি নাকি? তুমি সবতাতেই ফোঁস করে ওঠো। হ্যাঁ, শোনো বাবা নোটন, যা বলছিলুম। আমি একটা বিরাট প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি। ব্যাঙ্কে অ্যাপ্রোচ করেছি। টাকাও পেয়ে যাবো। বিরাট আকারে ফিশারি পোলট্রি আর ডেয়ারিতে ইনভেস্ট করব। কেমন হবে বলো তো?

অরুণ বলল, খুব ভালো হবে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট, যেখানেই গেছি, এমন সব বিগ ফার্ম দেখেছি। আপনি ঠিক কাজেই হাত দিয়েছেন জ্যাঠামশাই।

দীননাথ একটু ভেবে ওর মুখের দিকে তাকালেন।—আচ্ছা, তুমি তো ডাক্তারী পাস করে এসেছ?

অরুণ নম্রভাবে মাথা দোলাল।

তা ডাক্তার মানে ডাক্তার। মানুষের রোগের চিকিৎসা করো। তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা, মানুষও তো প্রাণী?

নিশ্চয়!

তার মানে লজিক্যালি দাঁড়াচ্ছে, তুমি প্রাণীর অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা করে থাকো। কেমন? এখন যদি বলি, তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো। করবে না?

অরুণ সায় দিয়ে বলল, নিশ্চয় করব।

দীননাথ খুশি হয়ে বললেন, তোমাকে আমি আমার ফার্মে রাখব। মুরগী হাঁস গরু বাছুর, মাছ, সবারই অসুখ-বিসুখ হয়। তুমি...

অরুণ সবিনয়ে বাধা দিয়ে বলল, সে তো ভেটেরিনারি সার্জেনের কাজ। আমি জ্যাঠামশাই পশু ডাক্তার তো নই। ওটা আলাদা ব্যাপার।

দীননাথ হাঁ করে তাকিয়ে বললেন, ও। তা মানুষের চিকিৎসা যখন শিখেছ, পশুচিকিৎসাটাও শিখে নিলে পারতে।

অরুণ সায় দিয়ে বলল, ঠিকই বলেছেন।

এই সময় গোকুলবাবু দৌড়ে এলেন।—হ্যাঁ, হে অরুণ, দেখেছ কাণ্ড? কত বার তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, অথচ কিছুতেই মনে পড়ছে না। আমার এই গালের ভেতরটা একবার দেখানো দরকার। সব সময় যেন সুপুরি পোরা আছে মনে হয়। এই দেখো, দেখেছ?

গোকুলবাবু হাঁ করলেন। এবং দেখাদেখি ক্রমশ একটা ভিড় সৃষ্টি হল বলা যায়। সবাই রোগী। নানা রকম শারীরিক অসুবিধা। অরুণ বিব্রত মুখে সবাইকে আশ্বস্ত করতে থাকল। এতক্ষণ দীননাথ হাঁ করে ব্যাপারটা দেখছিলেন। এবার অসহ্য লাগল। আচমকা বিকট গর্জে উঠলেন তিনি, অ্যাই! কী হচ্ছে সব? অ্যাঁ? এ কি হাসপাতাল—হসপিট্যাল? দাতব্য চিকিৎসালয়? এই গোকুলবাবু! তুমি জমিতে যাও, দেখো, মুকুন্দ লোক লাগিয়েছে নাকি? রাঘব! তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস? এক্ষুনি ট্রাক এসে যাবে।

উত্তরা ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিল। অরুণ মুখ তুলতেই চোখাচেখি হল পরস্পর। অরুণ হাসল। কারণ উত্তরাও হাসছিল ব্যাপার দেখে।

দীননাথ বললেন, হ্যাঁ। লোক-হাসানো কাণ্ডই বটে। তা অরুণ, ইয়ে—তোমার এবেলা এখানে নেমন্তন্ন রইল। উত্তরাও এসেছে। দেখা হয়নি? তোমার কথা বলছিল বটে। চিনতে পারেনি। বলে মুখ তুলে মেয়েকে দেখতে পেলেন। ওই যে! যাও, গিয়ে গল্পসল্প করো। আমি আসছি।

অরুণ একটু ইতস্তত করছে দেখে দীননাথ ফের বললেন, চলে যাও না! এ বাড়িতে সবার অবারিত দ্বার। আর তুমি তো আমার ঘরেরই ছেলে এক রকম। ওই যা! ট্রাকের শব্দ হচ্ছে না? রাঘব, রাঘব!

উনি চলে গেলেন বাড়ির পিছন ঘুরে খামারবাড়ির দিকে। অরুণ ওপরে উঠে গেল।

উত্তরা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, সঙ্গে আরশোলা আনছ না তো?

অরুণ শরীর ঝেড়ে নেওয়ার ভঙ্গী করে অপ্রস্তুত মুখে বলল, না না। ঘর ছেড়ে ওরা বেরোয় না। বাইরে যা গরম!

দুজনে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসল। উত্তরা বলল, মনে হচ্ছে তোমার প্রচণ্ড ফিউচার প্রসপেক্ট আছে। এ বাড়ির ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান হতে পারবে।

অরুণ একটু হেসে বলল, কিন্তু তোমার বাবার প্রপোজাল অন্যরকম।

কী রকম, শুনি?

মুরগী, হাঁস, গরু এবং পুকুরের মাছের ডাক্তার চান। আগে জানলে ভেটেরিনারি পাস করেই আসতুম।

হারধনকে দেখা গেল সিঁড়ির মুখে।—দাদাবাবুর আমিষ না নিরামিষ গো?

উত্তরা বলল, তার মানে?

হারাধন জবাব দিল, বাবুমশাই ওঁকে খেতে বললেন যে! তাই জানতে

এলুম। অরুণ কী বলতে যাচ্ছিল, উত্তরা বলে দিল, আমিষ। মুরগীর মাংস। তা আগে চা-টা পাঠিয়ে দাও হারাধনদা।

তারপর অরুণের দিকে ঘুরে বলল, অবশ্য বাবা জানলেই মুশকিল। পোলট্রির মুরগী মারা বারণ। তবে তুমি ভেব না, হারাধনদা ম্যানেজ করে দেবে।

অরুণ বলল, তুমি মুরগী খাও না?

ভীষণ খাই।

বাবা টের পান না?

উঁহু। হারাধনদা এমন করে মাংসের টুকরো কাটে, দেখলে মনে হয় ডালের বড়া জাতীয় কিছু। কাল তো বাবা ছিলেন না, মুরগী কেটেছিল। রাতে খাবার সময় বাবা আমার বিশেষ বাটিটার দিকে সন্ধিগ্ধ দৃষ্টে তাকাচ্ছিলেন। হারাধনদা বলে দিল, ওটা টকের তরকারি। বাবা টক খান না কিনা।

দুজনে খুব হাসল। তারপর অরুণ বলল, যাক গে। কিঞ্চিৎ স্মৃতিচর্চা করা যাক। কী বল?

উত্তরা মাথা নাড়ল।

অরুণ সিগ্রেট ধরিয়ে পা ছড়িয়ে হেলান দিল। বলল, সত্যি, যাই বলো, মানুষের জীবনে ছেলেবেলাটাই সব কিছু ধরে রাখে। তোমার কী মনে হয়? যেমন ধর ষোলো সতেরো বছর বয়স থেকে এতগুলো দিন বাইরে বাইরে কাটালুম। অথচ কী আশ্চর্য, সব সময়ই গঙ্গার ধারের ওই শিমুলগাছটা, শ্মশানবট, চর, সবকিছু মনে পড়ত। মন টানত। ভীষণ টানত। মনে হত, এক্ষুনি দৌড়ে চলে যাই। অথচ বাস্তবে তখন আমি হাজার মাইল দূরে। কী ট্রাজিক ব্যাপার দেখ।

উত্তরা বলল, সবার বেলা তা নয়। সবাই ও নিয়ে মাথা ঘামায় না।

যেমন তুমি।

উত্তরা তক্ষুনি সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমি। আমার তেমন কোনো ছেলেবেলা খুঁজেই পাইনে।

অরুণ সংশয়ান্বিত দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, আদৌ খুঁজেছ কি?

হুঁউ। বলে উত্তরা চোখ ফিরিয়ে নিল।

এসব সময় মেয়েদের রহস্যময়ী লাগে।

অরুণ অন্যমনস্কভাবে কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা সরু কাঁচি বের করল। সেটা দিয়ে বাতাস কাটতে থাকল। এই মেয়েটা ছেলেবেলায় যত কৌতূহলী

ছিল, তত ভীতুর হদ্দ। এখনও তেমনি আছে। মুখে স্পষ্ট সেই বালিকা-বালিকা ন্যাকা-ন্যাকা ভাব রয়ে গেছে। দাদুর ভয়ে একসময় সেই বিতর্কিত জমির আনাচে কানাচেও যেতে সাহস পেত না। দোতলার ছাদে করুণ মুখে বসে থাকত। এখনও সেই বসে থাকা দিব্যি দেখতে পাওয়া যায়। অরুণ দূর থেকে মুখ ভ্যাংচাত। তখন জানলা বন্ধ করে দিত। কিন্তু কলকাতা ফেরার দিন যে কোনো ভাবে দেখা হয়ে যেতোই। অরুণের মনে না থাকলেও মনে পড়িয়ে দিত যে তারা ফিরে যাচ্ছে। সামনের পুজোয় আবার আসতে পারে, না-ও পারে। এবং এই ছোটখাটো মেলামেশাগুলোর মধ্যে বাল্যপ্রেমের কোনো ব্যাপার অরুণ দেখেনি, এখনও দেখছে না। উত্তরা—জাস্ট একটা মেয়ে। তাকে নিয়ে মজা করা যায় একটু-আধটু।

ব্যস! তার বেশি নয়। পরক্ষণেই আবার নিজের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সন্দেহাকুল হল। আড়চোখে উত্তরাকে দেখতে থাকল।

উত্তরা হঠাৎ ঘুরে বলল, ও কী? কাঁচি! কাঁচি কিসের?

অরুণ অপ্রস্তুত হাসল।—অ্যাঁ? হ্যাঁ। তারপর তক্ষুনি কাঁচি ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল, লুকিয়ে ফেলার ভঙ্গীতে।

কাঁচি নিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?

পকেট কাটা অভ্যাস আছে নাকি? উত্তরা হাসতে হাসতে বলল।

না না! ও কিছু না!

কিছু না মানে? আস্ত কাঁচি—আবার বলছ কিছু না? কই দেখি—দেখি। বলে উত্তরা হাত বাড়াল।

অগত্যা অরুণ কাঁচিটা বের করে দিল। উত্তরা সেটা নেড়ে চেড়ে দেখে বলল, এ তো সার্জারির কাঁচি মনে হচ্ছে!

অরুণ একটু স্মার্ট হল তক্ষুণি। বলল, হ্যাঁ। ডাক্তারের হাতে সার্জারির কাঁচি থাকাটা স্বাভাবিক। যাক গে, শোনো যা বলছিলুম। কী বলছিলুম যেন?

উত্তরা ওর মতই কাঁচিতে বাতাস কাটতে কাটতে বলল—স্মৃতিচর্চা।

স্মৃতিচর্চা। দেখ লালী, তখন যেটা বলছিলুম, ছেলেবেলা। ছেলেবেলাটা ভীষণ মারাত্মক। ওই সময় মনে যা একবার ঢোকে, তা বাকি জীবন কিছুতেই মন থেকে তাড়ানো যায় না।

উত্তরা আনমনে বলল, তোমার মনে কি কিছু ঢুকেছিল?

কিছু মানে? অনেক কিছু। অরুণ সোৎসাহে সোজা হয়ে বসল।

যেমন?

যেমন ধরো, এই তুমি!

আমি? তার মানে? উত্তরা জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে তাকাল ওর চোখের দিকে। অরুণ ভড়কে গিয়ে বলল, মানে, তোমাকে ঠিকই মনে ছিল। দেখামাত্র তাই চিনতে পেরেছিলাম। ছেলেবেলার মতোই সারাপথ কিছু মজা করলুম। উত্তরা নির্বিকার মুখে বলল, আমার কোনো ছেলেবেলা-টেলা নেই। তাই তোমায় চিনতে পারিনি এবং মজা করার অভ্যাসও নেই।

অরুণ হঠাৎ বলে উঠল, আরে! কী সর্বনাশ! তোমার গলায় ওই চেরা দাগটা কিসের? দেখি—দেখি! এবং সে ঝুঁকে পড়ল উত্তরার গ্রীবার দিকে।

উত্তরা নিজের গ্রীবাটা দেখার চেষ্টা করে বলল, গোকুলকাকার চেঙ্গিস খাঁয়ের নখে চিরেছে।

সর্বনাশ! অ্যান্টিসেপটিক কিছু লাগিয়েছ? লাগাওনি? করেছ কী? অরুণ ব্যস্ত হয়ে উঠল।—ফুলে উঠেছে যে! দেখি দেখি—

উত্তরা তাচ্ছিল্য করে বলল, ভ্যাট! ও কিছু না।

কিচ্ছু না কী বলছ? যা দেখছি, ভালো মনে হচ্ছে না। মাইন্ড দ্যাট, আমি ডাক্তার।...অরুণ স্মার্ট হয়ে গম্ভীর স্বরে বলল। তারপর সোজা ওর গ্রীবার দিকে হাত বাড়াল। উত্তরা বাধা দেবার আগেই সে তার ডাক্তারী হাতে চেরা দাগটা পরীক্ষা করতে থাকল।

উত্তরার অস্বস্তি হচ্ছিল। হেসে ফেলল সে।—আঃ, কাতুকুতু লাগছে যে! এক মিনিট। বলে অরুণ ব্যাগ থেকে শিশি আর তুলো ইত্যাদি বের করে টেবিলে রাখল। একটু পরে সে যখন সযত্নে উত্তরার গ্রীবায় অ্যান্টিসেপটিক ওষুধ লাগিয়ে মলমের ওপর প্লাস্টার সাঁটছে, আচম্বিতে বিনা নোটিসে বজ্রগর্জনের মতো সিঁড়ির মুখে ধ্বনিত হল—উত্তরা!

দুজনে চকিতে ঘুরে দেখল, ক্ষমা এসে গেছেন।

উত্তরা উঠে দাঁড়াল।—মা! কিসে এলে? গাড়ির শব্দ শুনলাম না তো? ক্ষমা গম্ভীর মুখে উঠে এসে গটগট করে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। উত্তরা একটু বিপন্ন বোধ করল। মায়ের এই স্বভাবটা খুব বাজে। কোনো ছেলের সঙ্গে মেশা একেবারে পছন্দ করেন না। ছাত্রী জীবনে বরাবর বড্ড কড়াকড়ি করে এসেছেন। এখনও তাই। ধর্মের বাতিকের পাশাপাশি অনিবার্যভাবে নীতির বাতিকও প্রচণ্ড আছে। উত্তরা পিছন পিছন ঢুকে হাসতে হাসতে বলল, বাবা দরজায় তালা বন্ধ করে এসেছেন বলেছেন। নিশ্চয় তালা ভাঙতে হয়েছিল। জানো, এজন্যে বাবাকে কী বকা না দিয়েছি!

ক্ষমা জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, ও ছেলেটা কে রে?

ও? ও তো সেই বাঁড়ুয্যেদের অরুণ মানে, নোটন!

নোটনই হোক, আর ছোটনই হোক। কিছু বলার থাকলে তোর বাবার সঙ্গে কথা বলবে।

ক্ষমাকে থামিয়ে দিয়ে উত্তরা বলল, আঃ! কী বলছ?

আমি ঠিকই বলছি। ক্ষমা গোঁ ধরে বললেন, হুঁউ, আমাকে গুরুদেব ঠিকই বলেছিলেন, মেয়েকে অমন করে চোখের আড়ালে যেতে দিও না, দিও না!

তারপর আজ রাত্রিবেলা কু-স্বপ্ন দেখলুম। এলুম কি সাধে? তোমার বাবা মেয়ে এতটুকু আড়াল হলেই তো একটা না একটা কীর্তি করে বসবেই!

উত্তরা রেগে গিয়ে চাপা স্বরে বলল, আবার ঝগড়া শুরু করলে? ছিঃ! বাইরের লোকের সামনে...

ক্ষমা পাল্টা রেগে বললেন, বাইরের লোকের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছ, তাতে কিছু নয়! বাঃ!

উত্তরা প্রায় ক্ষেপে যাচ্ছিল। এখন যাকে বলে সিন ক্রিয়েট করার ব্যাপার হবে। তাই সে নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করে বলল, মোরগে আমার গলা চিরে দিয়েছে। সেপটিক হয়ে গেছে। ও একজন ডাক্তার। না জেনে না শুনে যা মুখে আসবে, বলে যাবে তুমি!

মেয়ের চোখে জল দেখে ক্ষমাও সংযত হলেন। এবং তক্ষুনি ওর গলার কাছে প্লাস্টারটার দিকে চোখ পড়ল। আঁতকে উঠে বললেন—অ্যাঁ! তাই তো! কিসে চিরেছে বললি? মোরগ? পোলট্রি! থাম, পোলট্রির নিকুচি করছি। বরাবর বলছি, ওসব ম্লেচ্ছ কাজকর্ম করো না। এবার পাপের ফলটা সোজা ফলে গেল। এখন চোখে দেখেও কি শিক্ষা হবে ওর?...

তা ইয়ে, ভালোই করেছিস ডাক্তার ডেকে। অ্যান্টি-টিটেনাস ইঞ্জেকশান করল না?

উত্তরা মাথা দোলাল।

ক্ষমা সভয়ে বললেন, কেন? সেবার আমার মামাশ্বশুরের ছেলে ঘোঁতন, তোর মনে নেই? সেই যে...

তরুণ সটান ঘরে ঢুকে ঝুঁকে প্রণাম করে বলল, কেমন আছেন জেঠিমা? আমি নলিনী বাঁড়ুয্যে মশায়ের ছেলে নোটন। চিনতে পারছেন তো?

আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ক্ষমা মুহূর্তে বদলে গেলেন। তক্ষুনি চিবুক ধরে আদর করে এবং আশীর্বাদ আওড়ে বললেন, নোটন! তুমি বাবা সেই নোটন!

তাই বলো বাবা! আমি চিনতেই পারিনি। এ মা গো! এত বড়টি হয়েছ তুমি? কোথায় থাকো এখন তোমরা? বাড়ি তো শুনেছি পড়-পড় দশা! ও নোটন, তোমার মা কেমন আছে? এ মা! আমার কী হবে দেখ! একটুও চিনতে পারিনি ছেলেকে।...

এরপর একদমে নিজেদের পারিবারিক নানা অশান্তি ইত্যাদির বর্ণনার পর গাড়ির খবর শোনালেন। মোহনপুরের বাঁকে বিগড়ে রয়েছে। বিপিন আছে সেখানে। মিস্ত্রি ডাকতে লোক পাঠিয়েছে। রিকশা যোগাড় করে দিয়েছে সে। ক্ষমা তাতেই এসেছেন।

তারপর আর অরুণকে ছাড়েন না। সঙ্গে গিয়ে ফার্মের গেটে হাজির হলেন। ভেতরে পা বাড়াবেন না, ম্লেচ্ছ অঞ্চল। সুতরাং দীননাথকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে হল! একগাল হেসে বললেন, এসে গেছ দেখছি! ভালো করেছ, খুব ভাবছিলুম। চুন্নী মেয়েটার ভয়ে তোমার ঘরের দরজায় তালা আটকাতে হল। বিশ্বাস করে চাবিটা আর কাকে দিই? এদিকে রোজ চুরিচামারি হচ্ছে ফার্মে। বসে থাকবারও উপায় নেই।

ক্ষমা থামিয়ে দিয়ে বললেন, খুব হয়েছে। শোনো, মোহনপুরের ওখানে গাড়ি বিগড়ে পড়ে আছে। এক্ষুণি লোক পাঠাও। তোমাদের যা চোর-ডাকাতের দেশ! এতক্ষণ বিপিনসুদ্ধ লোপাট হয়ে গেল কি না কে জানে! জেনে-শুনে শ্বশুরমশাই আর জায়গা পাননি, ছুটেছিলেন কুসুমপুরে!

শুনেই দিশেহারা হয়ে দীননাথ বেরোলেন।....

গিন্নিমা ফার্ম এলাকা মাড়ান না। কিন্তু খোঁজখবর সবই নেন। ধান চাল ছোলা মসুর ইত্যাদির হিসেব দিতে হয়। দীননাথ খুব বাধ্য মানুষের মতো গিন্নির পরামর্শ মেনে নেন অনেক সময়। শুধু বিপদ আসে গোকুলবাবুর। তাকে গিন্নি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, কারণ উনি মোরগ নিয়ে ঘোরেন। গোকুলবাবু মনমরা হয়ে আড়ালে আড়ালে ঘুরছেন। চেঙ্গিস খাঁ ইদানীং বড্ড অবাধ্য হচ্ছে। যুবক বয়সের ধর্ম আর কী! মুরগী যুবতী যুবতী সুন্দরীদের দিকে ট্যারা চোখে তাকায়। পায়ে সরু শিকল বেঁধে রেখে তারপর গোকুলবাবু এসেছেন গিন্নির সঙ্গে দেখা করতে।

ক্ষমা বাঁকা মুখে বলেন, এই যে পাদরি সায়েব! এতক্ষণ কোন গির্জায় ছিলেন? জিভ কেটে গোকুলবাবু বলেন, আ ছি ছি! দিদি, খাঁটি বামুনের ছেলে। ও কী কথা! বলে পৈতেটি বের করে দেখিয়েও দেন। তারপর বলেন, দেশে

ঘোর খাদ্যসঙ্কট দিদি। আর ওই প্রাচীন ধ্যানধারণা আঁকড়ে থাকা কি উচিত? অবিশ্যি কুক্কুট মাংস নিষিদ্ধ, এমন কথা প্রাচীন শাস্ত্রে কোথাও নেই।

ক্ষমা তেড়ে বলেন, থামো! তোমার কাছে শাস্ত্র শুনতে চাইনি।

এখন গোকুলবাবু দেখা করতে এসেই বিপদে পড়ে গেলেন। উত্তরার গলা ফেড়ে দিয়েছে চেঙ্গিস খাঁ। ক্ষমা আগুন হয়েই ছিলেন। বললেন, স্পষ্ট কথা শোনো গোকুল। হয় তুমি থাকবে, নয় তো তোমার ওই মোগল হতচ্ছাড়া থাকবে। দেখেছ, উত্তরার কী অবস্থা করেছে? ঘা দগদগ করছে, ফুলে ঢোল! জ্বর এসে গেল পর্যন্ত! যদি বিপদ আপদ কিছু হয়, তোমাকে হাজতে পাঠাবো মনে রেখো।

গোকুলবাবু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, সে কী! উত্তরা মা তো বেশ হেসে খেলে বেড়াচ্ছে দেখলুম! আ ছি ছি!

ন্যাকা! ডাক্তার দেখানো হচ্ছে, জানো না? ক্ষমা ফুঁসে উঠলেন।

গোকুলবাবু ব্যাকুল ভাবে ডাকতে থাকলেন, উত্তরা! মা উত্তরা! আ ছি ছি! অমন কাণ্ড হয়েছে, তা বলবে তো। চোখের সামনে অত বড় জুয়েল ডক্টর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয় করবেন না দিদি। বাঁড়ুয্যেদের অরুণ বড় ডাক্তার হয়ে এসেছে। এক্ষুনি ডেকে আনছি। ক্ষমা বললেন, তোমাকে আর ডাকতে হবে না। সে দেখে ওষুধ দিয়েছে।

গোকুলবাবু আশ্বস্ত হয়ে বললেন, দিয়েছে! তবে তো হয়েই গেল। বুঝলেন দিদি, অরুণ যেমন-তেমন ডাক্তার নয়। মানে ফ্যালনা এম.বি.বি-এস নয়। এক্কেবারে এম.ডি, ডক্টর অফ মেডিসিন। তার ওপর সার্জারিতে তো দেশের সেরা। সব খোঁজখবর নিয়েছি কি না।

ক্ষমা একটু কৌতূহলী হয়ে বললেন, তা অত বড় ডাক্তার হয়ে এই শেয়াল গাঁয়ে ফিরে এলো যে?

এল। টান দিদি, স্রেফ মাটির টান। হোম সুইট হোম! ওর মতো জনদরদী ছেলে ঠিক ভেবেই এসেছে। গ্রামে বড় ডাক্তার নেই। লোকের অসুখ-বিসুখে ভালো চিকিৎসা হয় না। ওর প্ল্যান হচ্ছে, ডাক্তারখানা খুলবে কুসুমপুরে। কম পয়সায় চিকিৎসা করবে।

ক্ষমা আনমনে বললেন, তাহলে করছে না কেন? অমন টো টো করে ঘুরে বেড়ায় কেন? এসেছে তো শুনলুম পাঁচ-ছ' মাস আগে।

গোকুলবাবু উৎসাহী হয়ে বললেন, করবেন কী ভাবে, বলুন দিদি—তত

পয়সা কোথায়? ক্যাপিটাল তো চাই। জমি-জমা যা কিছু ছিল, সব তো বেচে দিয়ে ওরা চলে গিয়েছিল। থাকবার মধ্যে এখন আছে শুধু ওই দশকাঠা জমির ওপর বাড়িটা। অরুণ বলছিল, গোকুলদা, হয়ত শেষ অবধি ওটা বেচেই কাজে নামতে হবে।

ক্ষমা মাথা দুলিয়ে বললেন, উঁহু হু! এমন সর্বনেশে বুদ্ধি কে দিল ওর মাথায়? বাড়ি বেচবে, বেচে ডাক্তারী করবে? মাথা খারাপ হয়েছে? এক্ষুনি ডেকে পাঠাচ্ছি ওকে।

গোকুলবাবু বললেন, শুধু ডাক্তারী তো নয়, বলছিল, কিসের রিসার্চ সেন্টারও খুলবে। অনেক প্ল্যান নিয়ে এসেছে কি না।

ক্ষমা গোকুলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্তে। কি বলবেন ভেবে ঠোঁট ফাঁক করলেন, কিন্তু বললেন না।

তখন গোকুল এদিক-ওদিক একবার ঝটপট তাকিয়ে চাপা গলায় বলে উঠলেন, একটা কথা বলব দিদি, রাগ করবেন না তো?

উঁ?

বলছিলুম কি, মানে...ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি...

হঠাৎ ক্ষমা লাফিয়ে উঠলেন প্রায়।—গোকুল, নোটনের ডিসপেন্সারি আর রিসার্চ সেন্টার না কি বললে, খুলুক। এক্ষুনি খুলুক। যত টাকা লাগে, আমি ব্যবস্থা করে দেবো। ডাক ওকে। বা রে! অমন সুন্দর সাদাসিধে ছেলে, অত বড় ডাক্তার, বাবা-মা'র মাথা খেয়েছে অকালে, তাই বলে কি আমরাও ওকে পর ভাবি? তুমিই বলো গোকুল! যাদের যাদের সঙ্গে বিবাদ ছিল, তারা কবে পরলোকে গেছে। সে পুরোনো ব্যাপারে আমাদের মাথাব্যথাটা কী? অ্যাঁ? তাই না গোকুল?

গোকুলবাবু ঘন ঘন মাথা দোলাতে থাকলেন, অবশ্য টুপিতে হাত রেখেই। নইলে পড়ে যাবার চান্স আছে। এবং এটাই ওঁর অভ্যাস।

ক্ষমা বলতে থাকলেন, জানো গোকুল, এসে চোখের দেখাতেই মায়া পড়ে গেল ওর ওপর। আহা, কেউ কোথাও নেই! ওকে আমাদের দেখা উচিত। তুমি এক্ষুনি ডাকো তোমার বাবুমশাইকে। ওকেও খবর দাও। একটা আলোচনা করা যাক বরং।

গোকুলবাবু আর চেপে রাখতে পারলেন না। বলে ফেললেন কথাটা, সেটাই আমার মাথায় সবসময় ঘুরছিল। জানেন দিদি, আপনাদের মেয়ের পাশে যা মানায়, আহা হা! যুগলমিলন হবে! ব্রিলিয়ান্ট হবে!

ক্ষমা চাঞ্চল্য চেপে ধমক দিলেন, নাচবে নাকি? যাও, ডাকো তোমার কর্তাকে। আর নোটনকেও খবর দিও।

দীননাথ স্ত্রীর তলব পেয়ে তক্ষুণি দোতলায় ধাবিত হলেন। গোকুলবাবু চললেন, বাঁড়ুয্যেবাড়ি।

বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে। মলোচ্ছাই! এমন চান্সটা মিস করে ফেলবে অরুণ! আফসোসে অস্থির হয়ে গোকুলবাবু ঘুরলেন। তারপর যাকে সামনে পান, অরুণের খবর জিগ্যেস করেন। কেউ দেখেনি। গেল কোথায় সে? দুঃখিত গোকুলবাবু কর্তা-গিন্নির চোখের আড়াল দিয়ে অগত্যা ফার্মে ফিরলেন। যা খামখেয়ালি স্বভাবের ছেলে! এমন অভূতপূর্ব সুযোগের ব্যবহার ওর দ্বারা হয়তো হবেই না!

বেলা পড়ে এসেছে। অন্যমনস্ক গোকুলবাবু ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার ধারে গেলেন। তখন যথারীতি ওঁর এক হাতে চেপেছে চেঙ্গিস খাঁ। অন্য হাতে ছড়ি। বালির চড়ায় গিয়ে সূর্যাস্ত দেখার অভ্যাস আছে।

ঘাটে শিমুলতলায় গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। চড়ায় বসে আছে দুই মূর্তি। সামনে সূর্যের লালচে দীপ্তি যতক্ষণ থাকল, ততক্ষণ চেনা গেল না। তারপরই চিনলেন। অরুণ ও উত্তরা।

বুড়ো গোকুলবাবুর মন ভরে গেল দৃশ্যটা দেখতে দেখতে। এই তো চেয়েছিলেন প্রথম দিন থেকেই। ব্রিলিয়ান্ট! মনে মনে দুজনের তারিফ করলেন। একবার ভাবলেন, গিয়ে খুশির খবরটা দেবেন, মন আবেগে তোলপাড় করছে। আবার ভাবলেন, ওরা লজ্জা পাবে। বরং অপেক্ষা করা যাক আড়ালে।

গাছের আড়ালে ওৎ পেতে অপেক্ষা করতে থাকলেন গোকুলবাবু। আর চেঙ্গিস খাঁ, আশ্চর্য, সেও চুপচাপ, ভারি শান্ত। তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি, মাই বয়।

কতক্ষণ পরে দুজনে এসেই সামনে পড়ে গেছে। দুজনেই অপ্রস্তুত। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে।

গোকুলবাবু পাদ্রীর মতো ছড়িসুদ্ধ একহাত তুলে বললেন, কল্যাণমস্তু!

দেখতে দেখতে কয়েক দিনের মধ্যে খবরটা রটে গিয়েছিল কুসুমপুরে। দীননাথ চেপে রাখতেই চেয়েছিলেন এবং স্ত্রীকেও খানিকটা মুঠোয় এনে ফেলেছিলেন বইকি। কিন্তু তবু যথেচ্ছ রটল। দীননাথের ধারণা, গোকুল বেশি হইচই করে বসেছেন। তাঁকে ধমকান। আফিংখোর মানুষের ব্যাপার। বেশি বকাবকি করলে ভেউ করে কেঁদেই ফেলবেন এবং চলে যাবার জন্যে পা বাড়াবেন। যাবার চুলো নেই, জানেন বলেই দীননাথ বরাবর আটকান। লোকটা আসলে খুবই সৎ প্রকৃতির এবং মন দিয়ে কোনো কাজে লাগলে তা নিপুণ ভাবে শেষ করবেনই। তাছাড়া সেই কবে থেকে দু'পুরুষ ধরে চৌধুরি পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন সুখে-দুঃখে। তিনি না থাকলে এই বাড়ি জমি-জমা বাগান-পুকুর ভূতের দখলে চলে যেতো কবে।

কিন্তু দীননাথ যা দিতে চাননি, ঠিক তারই কিছু লক্ষণ দেখা দিল ক্রমশ। বাঁড়ুয্যেদের সঙ্গে জমি নিয়ে বিবাদের সময় ওদের পক্ষে প্রধান সাক্ষী ছিল গাঙ্গুলিরা। প্রভাকর গাঙ্গুলি। বিলিতী সওদাগরী কোম্পানিতে চাকরি করে সে আমলে অঢেল টাকা আর সম্পত্তি কিনেছিলেন ভদ্রলোক। বুড়ো থুত্থুরে হয়ে মারা গেছেন। তিন ছেলের মধ্যে বড় ও মেজ কলকাতাবাসী, ছোটোর সঙ্গে প্রচণ্ড বিবাদ। ছোটোর নাম ব্রজরঞ্জন। কুসুমপুরেই আছেন। গাঙ্গুলি অ্যান্ড সন্স নামে মস্ত দোকান চলছে এখন। ছেলেরাই চালাচ্ছে। স্টেশনারি, কাপড়-চোপড়, লোহা-লক্কড়, আবার তেল কোম্পানির ডিলারশিপও আছে। কয়েক বছরে ফুলে ফেঁপে টইটম্বুর ব্যবসা।

ব্রজরঞ্জনকে দীননাথ দুচক্ষে দেখতে পারেন না। কুসুমপুরের সবার সঙ্গে তাঁর বনে, ওই লোকটি বাদে। দেমাকি স্বার্থপর মানুষ দীননাথের চক্ষুশূল। তা ছাড়া আরও কিছু কারণ আছে। দীননাথ এক সময় গ্রামে আসা ছেড়ে দিলে গোকুলবাবুকে ফুসলানি দিতেন ব্রজ গাঙ্গুলী, তোমার কর্তাকে বল না হে গোকুল, খামোকা সম্পত্তিটুকু আগলে রেখে হবেটা কী? গভর্নমেন্ট যে খপ করে কেড়ে-কুড়ে নেবে, তখন হাত কচলানো ছাড়া উপায় থাকবে না! ভালো দাম দেবো, ছেড়ে দিক।

শুধু এই নয়, আড়ালে দীননাথকে উনি ঠাট্টা করে মুরগী চৌধুরি বলে থাকেন নাকি। গোকুলবাবুই জানিয়েছিলেন। শুধু মুরগী চৌধুরি নয়, শ্রীমুরগীচরণ চৌধুরি! সেই থেকেই এখানে দীননাথের একটা নেপথ্যের নাম চালু হয়ে আছে ঃ মুরগীবাবু!

বটে? ঠিক আছে। মওকা এলে দেখে নেবো'খন। তখন বুঝবেন চৌধুরিদের রক্তের রং এখনও ফিকে হয়ে যায়নি। দীননাথ গোকুলবাবুর সামনে খুব লম্ফঝম্ফ করে এসব বলেছিলেন। বলেছিলেন, আমি যদি মুরগীবাবু, ও যে মুরগীচোর! এই যে দিনের পর দিন যত মুরগী বাড়াচ্ছি, তত কমছে। চুরি করছেটা কে? অ্যাঁ? আলবৎ ওই ব্যাটা বেজা গাঙ্গুলির কীর্তি! কিপটে। একটা পয়সা খরচ করে কোনোদিন কিছু খেতে তো শুনিনি! সবই লাভের মাথায় খায় পরে। পাচ্ছে বিনি পয়সায় চুরি করা মাংস। নোলা চুবিয়ে খাচ্ছে। গোকুল, এবার নির্ঘাৎ বেজার নামে থানায় ডাইরি ঠুকে আসব তুমি দেখে নিও। ফের স্টক চুরি যাক না, দেখো কী করি!

কিন্তু সত্যি সত্যি ডাইরি করতে যাননি দীননাথ। যত গর্জান, তত বর্ষান না। শেষ অব্দি গোকুলবাবুকে নিয়েই পড়েন।—আর তুমি হতভাগা কেন ওর আড্ডায় যাও, শুনি? খবরদার, ফের যদি টের পাই, বেজা গাঙ্গুলির সঙ্গে কথাবার্তা বলেছ, দেখবে কী ঘটে যায়!

গোকুলবাবুর স্বভাব। নদীর ধারে বিকেলবেলা ঘুরতে ঘুরতে সদরঘাট হয়ে বাজারে ঢুকবেন এবং এখানে ওখানে কিছু কিঞ্চিৎ আড্ডা দেবেনই। তারপর আবগারি দোকানে ঢুঁ মেরে কুবের সিংয়ের কাছে আফিং কিনে ডেরায় ফিরবেন।

দিগন্তে কালো মেঘের কারচুপি প্রথম গোকুলবাবুরই চোখে পড়েছে। সেটা সবিস্তারে জানালেন বাবুমশায়ের কাছে। হুঁ, দীননাথ তাই অনুমান করেছিলেন। গাঙ্গুলিবাড়ি অরুণ নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছে এটা এর আগের খবর। অরুণ নিজের মুখেই বলেছিল।

গোকুলবাবুর খবর গুরুতর। ব্রজ গাঙ্গুলি অরুণকে বাজারে চৌমাথার কাছেই একেবারে রাস্তার ধারে পাঁচ কাঠা জায়গা দিতে চেয়েছে। নার্সিং হোম খুলুক। রিসার্চ সেন্টার খুলুক। যা খুশি করুক। একটা প্রতিভাবান আদর্শবাদী ছেলে নিজের জন্মভূমির সেবা করতে চায়,এতে গাঙ্গুলিদের সায় না থেকেই পারে না। কুসুমপুরে গার্লস হাই স্কুলের জমি তো তারাই দিয়েছে।

শুধু তাই নয়, জমির ওপর বাড়ি তৈরির খরচেও পরোয়া নেই। গাঙ্গুলি আর বাঁড়ুয্যেরা পুরুষানুক্রমে বন্ধু, একে অন্যের সুখ-দুঃখে পাশে পাশে থেকেছে।

কিন্তু ব্যাপারটা কী? মানে—কেন? দীননাথ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন গোকুলবাবুর দিকে।

গোকুলবাবু স্বভাবমতো এপাশ ওপাশ দেখে মুখ নামিয়ে চাপা গলায় বললেন, মানে ইজ ক্লিয়ার। জয়ন্তী।

জয়ন্তী।

আজ্ঞে হ্যাঁ, জয়ন্তী। বেজা গাঙ্গুলির ছোট মেয়ে।

সব আঁচ করেও না বোঝার ভান ছিল দীননাথের। এবার মাথা নেড়ে বললেন, হুঁ! বেশ। তা অরুণ কী বলছে?

অরুণকে তক্ষুনি ধরেছিলুম। কিন্তু অরুণ শুধু হাসল।

হাসল মানে?

হেসে উড়িয়ে দিল।...গোকুলবাবু আশ্বস্ত করে বললেন। ও আপনি ভাববেন না বাবুমশাই। নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোন। অরুণ যাবে কোথায়?

দীননাথ রাতে খাওয়া দাওয়ার পর স্ত্রীর কাছে কথাটা তুললেন। ইদানীং দুজনে ভারি ভাব, একেবারে খিটিমিটি বাধছে না। অরুণ-উত্তরার ব্যাকগ্রাউন্ডে এটা নিশ্চয় সম্ভব হয়েছে। বাড়িতে যেন উৎসবের সুর বাজছে নেপথ্যে।

হঠাৎ এই বেসুরো ব্যাপারটা এসে জুটল। ক্ষমা তক্ষুণি উঠে বসলেন বিছানায়। বসেই কিছুক্ষণ কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে ধ্যানস্থ হলেন। ঘর অন্ধকার। দীননাথ দুবার ডেকে সাড়া না পেয়ে হাত বাড়ালেন। তারপর টের পেলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকলেন। একটু পরে ক্ষমার কথা শোনা গেল।—ও কিছু হবে না। দেখে নিও। গুরুদেবের কৃপা হবে।

দীননাথ হাসবার চেষ্টা করলেন।—তুমি বুঝি ধ্যানে গুরুদেবকে দেখলে?

দেখলুম বইকি।

হুঁ। কী বললেন?

হবে।

দীননাথ ফের ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হবে না। গাঙ্গুলিদের তুমি ভুলে গেছ। খুব সোজা লোক নয়। ছেলেটার মাথা বিগড়ে দিয়েছে। ক্ষমা ধমক দিয়ে বললেন, বাজে বোকো না। তুমি চোখ থেকেও কানা, তাই বলছ। এত সব দেখেও বুঝতে পারছ না, ওদের পরস্পরকে মনে ধরেছে?

অরুণ আজকাল অবশ্যি লজ্জা করে তেমন আসে না, কিন্তু আমি জানালায় বসে সবই দেখতে পাই।

কী দেখো বলো তো?

তোমার মেয়ে যায় ওর ওখানে। একসঙ্গে বেড়ায়। গাড়ি চেপেও যায় কত সময়।

বলো কী! সর্বনাশ! এতদূর গড়িয়েছে?

সর্বনাশ? সর্বনাশ কিসের? তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

দীননাথ একটু ইতস্তত করে বললেন, আহ্, বুঝছ না কেন? কী হবে ভবিষ্যতে, তার তো কিছু ঠিক নেই এখনও, জাস্ট একটা প্রস্তাব উঠেছে। ওরা আফটার অল ইয়ং ব্লাড, কিছু বিপদ আপদ বাধিয়ে বসলে...

ক্ষমা তেড়ে উঠলেন, বাপ হয়ে সাপ-ব্যাঙ মুখে যা আসছে বলতে বাধছে না। ধিক্ তোমায়।

দীননাথ চটে গেলেন।—বা রে! তুমিই তো বরাবর ওর মেলামেশায় কড়াকড়ি করেছ। এখন উল্টো হয়ে গেছ দেখছি।

ক্ষমা তাঁর স্ত্রী-লজিক অনুসারে পাল্টা চটে বললেন, তার মানে গোড়া থেকেই তোমার ইচ্ছে ছিল না, বোঝা যাচ্ছে। শুধু আমায় হ্যাঁ দিয়ে গেছ। হুঁউ। বেশ বুঝতে পারছি। তা, এতকাল তো মেয়েকে ঘরে বসিয়ে রেখেছ, দিল্লি, বোম্বে, মাদ্রাজ, লন্ডন থেকে জামাই আনবে বলে খুব বড় বড় বোলচাল ঝেড়েছ। শেষ অব্দি তো সবই চিচিং ফাঁক! আর আজ আমি যদি বা একটা ঘাটে নৌকো বাঁধার কথা তুললুম, তাতে তোমার বাগড়া। কেন? মেয়ে কি তুমি গাছ থেকে পেড়ে এনেছ, না আকাশ থেকে পড়েছে—টুপ করে কুড়িয়ে এনেছ? আমার বুঝি কোনো দামই নেই? বাঃ! চমৎকার!

ক্ষমা খাট থেকে হন্তদন্ত হয়ে নামতে শুরু করেছেন, নির্ঘাৎ মেঝেয় গিয়ে শুয়ে পড়বেন। বরাবর এসব ক্ষেত্রে তাই করেন। দীননাথ ওঁকে দু'হাতে চেপে ধরলেন। ধস্তাধস্তি শুরু হল একটুখানি। কিন্তু সেই সময় বাইরে ফার্মের দিকে চেঁচামেচি শোনা গেল, চোর! চোর! ধর! মার!

অমনি দীননাথ একলাফে জানালার কাছে গিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠলেন, ফায়ার! ফায়ার! গোকুল! ফায়ার করো!

ক্ষমা সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন। ফার্মের দিকেও পটাপট আলোগুলো জ্বলে উঠল। হইচই জোর চলতে থাকল।

দীননাথ দরজা খুলে টর্চ হাতে নেমে গেলেন। সামনে আওয়াজ দিচ্ছেন তিনি—ফায়ার! ফায়ার! তারপর গোকুলবাবুর বন্দুকের শব্দ হল। পরপর দু'বার। কোথায় কুকুর ডাকতে থাকল। ক্ষমা কাঁপতে কাঁপতে পাশের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলেন।—উত্তরা! উত্তরা!

কয়েকবার ডাকাডাকির পর আলো জ্বেলে উত্তরা দরজা খুলে দিল। ঢুলতে ঢুলতে বলল, কী ব্যাপার?

ডাকাত পড়েছে, ডাকাত! ক্ষমা ভয়ার্ত স্বরে বললেন।

ভ্যাট! মুরগীচোর এসেছিল। জ্বালাতন! আমার ঘুম পাচ্ছে বাবা! বলে উত্তরা গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ক্ষমা মেয়ের পাশে বসে রইলেন। তাঁর কাঁপুনি যাচ্ছে না। কী চোর ডাকাতের দেশ সব! এর চেয়ে কলকাতায় কত নিরাপদে থাকেন! অন্যবার হলে সকালেই যাবার জন্য জেদ ধরতেন। কিন্তু এবার অন্য ব্যাপারে আটকে গেছেন। শেষ-মেশ না করে যাওয়া যায় না। হুঁ, শেষ-মেশ একটা হোক—তারপর এখানে আর নয় বাবা! মেয়ে জামাইকে সোজা কলকাতার বাড়িতে তুলবেন। যা করার, ওখানেই করবে জামাইবাবাজি। এই বনবাদাড়ে পচে মরবে অমন সোনার চাঁদ ছেলেটা? ক্ষমা বেঁচে থাকতে তো নয়ই।...

এতদিন সব সহ্য করে আসছিলেন দীননাথ। কিন্তু এবার আর পারলেন না। থানায় জানিয়ে এলেন। সকালেই ইন্দ্রমোহন দারোগার আবির্ভাব ঘটল খামারবাড়িতে। ভদ্রলোক বরিশালের আদি ও অকৃত্রিম লোক, কথায় কথায় সেটা জানিয়ে দেন এবং এতেই তাঁর বিশ্বাস 'ঘটিগো পিলা চমকাইয়া যায়।' মাথায় বিপুল টাক এবং পেটে বিস্তৃত ভুঁড়ি আছে। কিন্তু তাঁর যোগ্য কেস কোথায়? এ তো নিতান্ত মুরগী চোরের কারবার! যাই হোক, দীননাথ চৌধুরির 'হনার'! এসে সার সার খোলামেলায় তৈরি মুরগীর খাঁচার চারদিকে ঘুরে ঘুরে যথাবিহিত তদন্ত করলেন। চুরির পদ্ধতি গতানুগতিক। তার কেটে চুরি। তারে শেয়াল বা অনুরূপ প্রাণীর লোম খুঁজলেন প্রথমে। তারপর জোরালো হাসি ছাড়লেন।—হঃ! বুঝেছি! মাইনষেরই কাজ! ঠিক কইছেন চৌধুরিমশায়!

গোকুলবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দীননাথ বললেন—আহা, সেটাই তো বলছিলুম আপনাকে। এখন বুঝুন তাহলে! লোকে যে ব্যবসা-বাণিজ্য করে খাবে, তার উপায় নেই! ভেবেছে, একা মনোপলি করে চালাবে? আশেপাশে তো অনেক পোলট্রি আছে। খোঁজ নিয়ে দেখুন, ওরা নিশ্চয় বেনামে কোনো-কেনোটার মালিক। নইলে আমার যা রিপোর্ট, ডিমের কারবার করার দিকে ওদের চোখ পড়ল কেন? কেনই বা চারটে ফ্রিজের অর্ডার

দিল? হ্যাঁ, চারটে ফ্রিজের অর্ডার দিয়েছে। কোম্পানিতে আমার চেনা লোক আছে, তার কাছেই শুনেছি। নির্ঘাৎ এবারে মুরগীর মাংসও বেচবে!

ব্রজ গাঙ্গুলির কথাই বলছিলেন দীননাথ। কিন্তু ইন্দ্রমোহন কান করলেন না। আচমকা গোকুলবাবুর কাঁধে খপ করে থাবা আঁকড়ে বলে উঠলেন—আপনি তো মশায় চোরের লগে খুব জাপটা-জাপটি করছেন কইলেন। অ্যাহন কন তো দেহি, চেনা ঠেকছিল নাকি?

থাবা খেয়েই গোকুলবাবু আতঙ্কে কাঠ হয়ে পড়েছেন। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, কতকটা চেনা মনে হল স্যার।

ভদ্রলোক চোর, নাকি ছুটোলোক চোর?

ভ...ভদ্রলোক বলেই মনে হল স্যার। আমি ঘাপটি পেতে ছিলুম—খাঁচায় কোঁ-কোঁ আওয়াজ শুনেই ঝাঁপিয়ে পড়লুম। তারপর...

দীননাথ রুদ্ধশ্বাসে বললেন, নামটা বলে ফেলো, গোকুল। আর চেপে রেখো না।

ইন্দ্রমোহন ধূর্ত হেসে বললেন, গায়ে জামা ছিল?

গোকুলবাবু জবাব ছিলেন।—ছিল স্যার।

ছিঁড়েছে?

হ্যাঁ স্যার। ছিঁড়েছে। এই দেখুন না, আমারও ছিঁড়েছে!

কী জামা ছিল, কন দেহি?

দীননাথ বলে উঠলেন, পাঞ্জাবি! পাঞ্জাবি!

কিন্তু গোকুলবাবু করুণ মুখে বললেন, পাঞ্জাবি বলে তো মনে হয়নি স্যার।...

এই ধরনের প্রশ্নোত্তর অনেকক্ষণ চলল। ইন্দ্রমোহন সদলবলে চলে গেলেন।

এর ব্যবস্থা কিছু হবেই—প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন।

তারপর দীননাথ পড়লেন গোকুলবাবুকে নিয়ে। পাঞ্জাবি ছিল না? চালাকি পেয়েছ? নেমকহারামির একশেষ! মিথ্যুক কোথাকার! যদি বলে দিতুম যে তুমি আফিং খাও রোজ সন্ধ্যাবেলা? আফিংয়ের ঘোরে ভুল দেখেছ! আফিংখোরের সাক্ষী টেকে না তা জানো?

গোকুলবাবু কাঁচুমাচু মুখে কেটে পড়লেন। হ্যাঁ, আফিং নিশ্চয় খান। কিন্তু আসল ঘটনা তো বলতে পারলেন না, পাছে তাঁর ওপর সন্দেহ গিয়ে পড়ে। তাড়া খেয়ে মুরগীসুদ্ধ চোর তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল বলেই তো

জাপটা-জাপটির সুযোগ পেয়েছিলেন! ঘর অন্ধকার ছিল। যখন আলো জ্বালাবার সুযোগ পান, তখন চোর উধাও।

তারপর আজ সকালবেলা যা ঘটেছে, তা আরও বিস্ময়। চোরের একপাটি স্যান্ডেল আবিষ্কার করেছিলেন ঘরের মেঝেয়। স্যান্ডেলটা কাগজে জড়িয়ে রেখেছিলেন। পুলিশ এলে সেটা দেবেন এবং দীননাথ থানা থেকে ফিরে এলে ব্যাপারটা তাঁকেও জানাবেন। কিন্তু কে চেঙ্গিস খাঁয়ের শেকল খুলে দিয়েছিল এবং তাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন। ফিরে এসে দেখেন, স্যান্ডেল উধাও। এসব গুহ্য খবর জানানো মানেই দীননাথের মারমূর্তির সামনে দাঁড়ানো। গোকুলবাবুর নার্ভের জোর কমছে। হাঙ্গামা এড়িয়ে নির্ঝঞ্ঝাট থাকাই পছন্দ করেন আজকাল। তাই চেপে গেছেন। এখন মনে মনে কিন্তু ওই গুহ্য রহস্য নিয়ে তোলপাড় চলছে। এক বিরাট প্রশ্ন বারবার মনে উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না। কিমিদং! এর অর্থ কী?...

গাঙ্গুলিমশায়ের কাছে কথাটা বেলাবেলি পৌঁছে গেল। ক্ষেপে যাবারই কথা। অ্যাদ্দিন কুসুমপুরের ঈর্ষাকাতর গোষ্ঠী গাঙ্গুলি অ্যান্ড সন্সের উন্নতিতে নানান কথা রটিয়েছে। বলেছে, চোরাকারবারি। স্মাগলার। লোক ঠকিয়ে ব্যবসা করে। এবার কি না মুরগীচোর!

ব্রজকিশোর আজকাল গদিতে যান না। সুদৃশ্য আধুনিক কায়দায় সাজানো বৈঠকখানায় আড্ডা দেন দুবেলা। ষাটের কাছাকাছি বয়স। প্রকাণ্ড মানুষ। আসন থেকে উঠতে অনেক পরিশ্রম হয়। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, দীনু বললে এ কথা? দারোগার কাছে? লোকের সামনে বললে? বলেই আবার শুধোলেন, অ্যাঁ? কী বললে?

দাশুবাবু কম্পাউন্ডার চৌধুরীদের খামারে কাকে ইঞ্জেকশান দিতে গিয়েছিলেন তিনিই খবর এনেছেন। বললেন, ছেড়ে দিন গাঙ্গুলিমশায়, এসব কথা কি গায়ে নিতে আছে?

না না। বল না, কী বললেন দীনে?

আজ্ঞে, মুরগীচোর বললে।

চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েই থেমে গেলেন ব্রজকিশোর। হুঁ বলে চুপ করলেন। চোখ বড়ো হয়ে রইল। একটু পরে সামলে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ হে দাশু, দীনু চৌধুরীটা হঠাৎ আমার পেছনে কেন লাগল, বুঝতে পারছ কিছু?

দাশুবাবু মুচকি হেসে বললেন, পারছি বইকি গাঙ্গুলিমশাই।

আহা, খুলেই বলো না হে!

দীনু চৌধুরী বাঁড়ুয্যের ছেলেকে জামাই করবে। আর এদিকে আপনি কি না তাকে জমি দিতে চেয়েছেন বাজারে। নার্সিংহোম খুলে দেবেন বলেছেন।

এতক্ষণে ব্রজকিশোর হো হো করে হেসে হাল্কা হতে পারলেন। অনেকক্ষণ হাসলেন। তারপর বললেন, তাও বটে! তা ওহে দাশু, বলি অরুণ তো আসলে বুনো পায়রা, মাঠে এসে চরছে। পারলে ধরুক না! তাই বলে আর কিছু পেলে না দীনু, আমাকে...আবার প্রবল হাসিতে কথা ভাসিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, আমাকে মু...মুরগী মুরগীচোর...হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

এই অট্টহাসির শব্দে একটা তোলপাড় জাগল। নাতি নাতনীরা দৌড়ে এসে পর্দা তুলে উঁকি মারল। ব্রজকিশোরের স্ত্রী মন্দাকিনী ভেতর থেকে জিগ্যেস করলেন, কী দেখছিস রে তোরা? হলটা কী?

নাতি নাতনীরা একস্বরে জবাব দিল, দাদু হাসছে!

মন্দাকিনী হাসতে হাসতে বললেন, কেন? দাদুর হাসি কখনও দেখিসনি?

মণিমুক্তো ঝরছে বুঝি? কুড়োগে না!

গিন্নির সাড়া পেয়ে ব্রজকিশোর ডাকলেন, এদিকে একবার আসবে গো? এসো, এসো, শোনো কী সব কাণ্ড হচ্ছে আজকাল!

মন্দাকিনী ঢুকে দাশুবাবুকে দেখেই ঘোমটা দিলেন এবং একটু ইতস্তত করলেন। গ্রাম্য প্রথার ছিঁটেফোটা এখনও সব পরিবারেই আগের জেনারেশন মেনে চলেন। ব্রজকিশোর তা লক্ষ্য করে বললেন, আরে দাশুই খবর এনেছে। ওর মুখে শোনো না। হাসতে হাসতে মরে যাবে! শ্রীমুরগীচরণ চৌধুরী কী করেছে শোনো!

দাশুবাবু চটপট জানালেন, খবর আর কিছু না। দীনু চৌধুরী দারোগার কাছে গাঙ্গুলি মশাইয়ের নামে ডাইরি করেছে!

মন্দাকিনী চমকে উঠে বললেন, কিসের ডাইরি? ও তো বাড়ি ছেড়ে বেরোতেই পারছে না!

আজ্ঞে, দীনু চৌধুরীর পোলট্রি থেকে প্রায়ই নাকি মুরগী চুরি যাচ্ছে। তা এবারে গাঙ্গুলিমশাইয়ের নামে মুরগীচোর বলে ডাইরি করেছেন! মন্দাকিনী হাঁ করে তাকালেন।

ব্রজকিশোর বললেন, বুঝলে না? হিংসেয়। অরুণ, অরুণকে নিয়ে গো! দীনে অরুণকে জামাই করতে চায় যে!

দাশুবাবু বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। মেয়েকে যে অরুণের পেছনে লেলিয়ে

দিয়েছেন। পরশু পলাশতলী থেকে আসছি, দেখি গাড়ি চেপে দু'জনে যাচ্ছে। দীনু চৌধুরীর মেয়ে নিজে গাড়ি চালায়, জানেন তো? একেবারে খেরেস্টানি বেলেল্লা চালচলন। তার ওপর শহুরে মেয়ে। লজ্জা-শরম বলতে কিছুই নেই।

মন্দাকিনী বললেন, বেশ তো! অরুণের যদি চৌধুরীদের মেয়েকে পছন্দ হয়, হোক—তাই করুক। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নেই! ব্রজকিশোর নড়ে উঠলেন।—কিন্তু অরুণ আমার কাছে লোন নিয়েছে অলরেডি, পাঁচ হাজার টাকা মুখের কথায় দিয়েছি। জব্বলপুর থেকে এসে ধরল, জেঠামশাই, একটা রিসার্চের ব্যাপারে কিছু যন্ত্রপাতি কিনতে হবে, টাকা দরকার। আমি বললুম, বা রে! এত জ্ঞানী কোয়ালিফায়েড ডাক্তার ছেলে। রিসার্চ করবে, করুক না। বলো দাশু, ঠিক্ না বেঠিক করেছি।

দাশুবাবু সায় দিলেন। মন্দাকিনী কঠোর মুখে বললেন, তেমন দেখলে টাকা ফেরত চাইবে। ব্যস, চুকে গেল!

ব্রজকিশোর স্ত্রীর কোনো মতামতে তর্ক করেন না। তক্ষুনি মেনে নেন। বললেন, হ্যাঁ! সোজা রাস্তা। টাকা ফেরত চাইব। সুদ সুদ্ধ চাইব। কী বল দাশু? এই পাঁচ-ছ'মাসে লোকালি সুদের যা রেট, তাই দাবি করব।

মন্দাকিনী চলে গেলেন গম্ভীর মুখে। দাশুবাবু একটু ইতস্তত করছিলেন। ঘরে আবহাওয়া থমথমে। গাঙ্গুলিমশায়ের মুড বোঝা কঠিন। কিন্তু আবার এক্ষুণি কেউ এসে পড়বে। এমন ফাঁকা থাকে না ঘরটা। তাই তিনি একটু কেসে বললেন—গাঙ্গুলিমশাই!

হুঁ। বল হে দাশু!

গোটাকতক টাকার দরকার ছিল।

ব্রজকিশোর খুকখুক করে হেসে উঠলেন।—তোমার খালি ওই কথা। আজকার তো আর আমি ক্যাশ বাক্সের সঙ্গে জড়িত নেই ভায়া। সব আমার ছেলেদের হাতে। রাগ হয়েছে—আর কতদিন টাকা পয়সা নাড়াচাড়া করবো, বলো? তুমি ওদের কাছে যাও বরং।

দাশুবাবু বিমর্ষ মুখে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে গিয়ে শুনলেন ব্রজকিশোর ফের হো হো করে হাসছেন আর বলছেন—মুরগীচোর! হুঁ শ্রীমুরগীচরণ চৌধুরী ছাড়া আর কার মাথায় এটা খেলবে? আমি আমি...মু...মুরগীচোর! হোঃ হোঃ হোঃ বাবা রে!

ক্ষুব্ধ দাশুবাবু ভাবলেন, ভুল হল। চৌধুরীমশাইকে তখন বললে, নিশ্চয়

ফেরাতেন না। টাকার বড্ড দরকার। কিন্তু তখন তো উনি পুলিশ নিয়ে ব্যস্ত। তার ওপর মানসিক চাঞ্চল্য তো বটেই। ঠিক আছে। খানিক বাদে আবার যাবেন ওখানে। টাকা আজ না পেলেই নয়।...

সন্ধ্যা অব্দি খুব অস্থিরতায় কাটিয়ে গোকুলবাবু চুপিচুপি বেরিয়ে পড়েছিলেন। আফিংটা ফিরে এসেই খাবেন। মাথায় প্রশ্নের পোকা কটকট করে কামড়াচ্ছে। দীননাথ গেছেন কলকাতা। ক্ষমাও সঙ্গে গেছেন। গুরুদেব নাকি স্বপ্নে ডেকেছিলেন। আর দীননাথ গেছেন কুকুর কিনতে। কুকুর সঙ্গে না নিয়ে তিনি ফিরবেন না।

পা টিপে টিপে গোকুলবাবু ঝোপঝাড় গাছপালার মধ্যে এগোলেন। তারপর খিড়কির দরজার সামনে পৌঁছলেন। সাপখোপের ভয় তিনি করেন না। রক্তে আফিংয়ের বিষ দারুণ কড়া। তাজা গোখরো একবার কামড়ে দেখুক না! তক্ষুণি বাছাধন ঘাড় দুমড়ে অক্কা খাবে। তাঁর কিস্যু হবে না।

আগাছায় ছোটো কপাট দুটো আঁকড়ে ধরেছে। পাঁচিলের মাথাটা এখানে নীচু। হাঁচোড়-পাঁচোড় করে অনেক কষ্টে উঠলেন, ফাটলে পা রেখে। উঠোন ভর্তি আগাছা। বাড়ি প্রায় অন্ধকার। শুধু কোণের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। এই পাঁচিলের নীচে কোথাও একটা কুয়ো ছিল মনে পড়ছে। শিউলির গাছও ছিল আন্দাজ করে বেড়ালের মতো এগোলেন। জোর ডাকাডাকি করছে পোকামাকড়গুলো। জোনাকি জ্বলছে ঝোপঝাড়ে। এই তো হয়! মানুষ পা তুললেই সেখানে জঙ্গল গজায় আর জীবজন্তু পোকা-মাকড়ের দল এসে জুটে যায়। এই বাড়ি একদিন কী ছিল!

হঠাৎ তাঁর গায়ের ওপর দিয়ে খটাস জাতীয় একটা জন্তু চলে গেল। গোকুলবাবু টাল সামলে নিলেন কোনো রকমে। কিন্তু কাঁপুনি শুরু হল। ঠকঠক করে কাঁপতে থাকলেন। কতক্ষণ পরে কাঁপুনি থামতে ভাবলেন, এখানেই নেমে পড়া যাক। কিন্তু পরক্ষণে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। কঁক...কঁক... কোঁ-অ-ক... কোঁ—অক। ওয়ান্ডারফুল সাকসেস! নিজের বুদ্ধির তারিফ করলেন মনে মনে।

হুঁউ—যা ভেবেছেন, তাই বটে। আর ভুল নয়, নিখাদ সত্যি।

কঁক...কঁক...কোঁ-অ-ক...! গোকুলবাবু লাফ দিলেন।

অমনি চাপা গলায় কেউ বলে উঠল—কে? তারপর কয়েক ঝলক টর্চের

আলো পড়ল। তখন গোকুলবাবু উঠোনের লেবুতলার আড়াল হয়েছেন। আলো নিভে গিয়ে আবার স্তব্ধতা জাগল। পোকামাকড়ের আওয়াজ আবার তীব্র হয়ে উঠল। কোথাও প্যাঁচা ডাকল বারকতক ক্র্যাঁও ক্রাঁও! গঙ্গার ধারে শ্মশানের কাছে শেয়াল ডেকে উঠল হুয়া হুয়া...কেয়া হুয়া...হো হো হুয়া!

গোকুলবাবু বারান্দায় উঠে আলো-জ্বলা ঘরের জানলায় উঁকি দিলেন। উঁকি দিয়েই থ। একটা ধারণা নিয়েই এসেছেন—সত্যি সত্যি দেখা গেছে। কিন্তু অন্যটা মাথায় আসেনি। আসা উচিত ছিল।

প্রথমে চোখ পড়েছিল কাগজে মোড়া সেই একপাটি স্যান্ডেলের দিকে। সেটা টেবিলে রাখা আছে। যে দিতে এসেছে, সে ভয়বিহ্বল হয়ে একবার এগোচ্ছে আর পিছোচ্ছে—অন্যজন অর্থাৎ শ্রীমান মুরগীচোর একটা মুরগী নিয়ে বলছে—দেখ, আহা দেখই না! কামড়াবে না, ভারি শান্ত। তুমি হাত রাখলেই আরামে চোখ বুজবে। যাঃ বাবা! এত ভয় কেন?

না না না! আমার ভয় করছে! ভ্যাট, রেখে দাও। দাও না! প্লিজ! তুমি...তুমি সেই চিরকালের ভীতু থেকে গেলে!

বেশি সাহস দেখানো ভালো নয়! এই, শোনো—এবার দেখাও না তোমার এক্সপেরিমেন্ট কীভাবে করো!

সে দেখেও তো ভয় পাবে। এই যে খোপ মতো যন্ত্রটা দেখছ—এতে মুরগীটা বসিয়ে দেব। কেমন? তারপর ওর পায়ের এক জায়গা একটু চিরে এই ওষুধটা ঢুকিয়ে দিয়ে সেলাই করে দেবো! ব্যস! তারপর ওয়াচ করব ক্রমাগত! মরে যাবে—তখন কোষগুলো চিরে, পরীক্ষা করব।

হু! এভাবে প্রাণীহত্যা করার কোনো মানে হয়?

ভুলে যেও না, সবই মানুষের স্বার্থে করা হচ্ছে। সেই আদিযুগ থেকে ইতর প্রাণীদের ওপর পরীক্ষা চালিয়েই মানুষের রোগের এত সব ওষুধ বেরিয়েছে। আর আমি যা করছি, তা তো এ যুগের বিরাট প্রবলেম। ক্যান্সার! তোমাকে তো বলেইছি, মা ক্যান্সারে মারা গেলেন চোখের সামনে। অসহায় হয়ে দিনে দিনে মাকে মরে যেতে দেখলুম।

আমি...আমি সেদিনই...

খুব হয়েছে। শোনো, আমার কথা হচ্ছে, তুমি এক্সপেরিমেন্ট করো, আর যা-ই কর—চুরি করে আনবে কেন? ভ্যাট! মুরগীচোর!

হো হো করে চাপা হাসল।—কী করি বল! ওই বিশেষ জাতের মুরগী তাহলে আমায় পুষতে হয়। ও ঝামেলা কী ভাবে সামলাবো বল? জঙ্গুলে দেশ।

লোক রাখতে হবে। ওদের লালন-পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। অত পয়সাই কোথায়? তার চেয়ে...

হুঁ, বুঝেছি। পাশেই পোলট্রি থাকতে ভাবনা কিসের? কিন্তু দেখ—ধরা কোনো এক সময়ে পড়বেই পড়বে। কাল রাতেই কী হতে যাচ্ছিল বলো তো? গোকুল কাকা যদি চিনে ফেলতেন! তোমার স্যান্ডেল কি আর উনি চেনেন না?

না না? সে ভেবো না। গোকুলকাকা মোগল সম্রাটের মতো সব সময় মুখ উঁচু করে থাকেন, লক্ষ্য করনি?

গোকুলবাবু ঘামছিলেন। মনে মনে তারিফও করছিলেন। বাঃ! চালিয়ে যাও!

কী দেখছ?

তোমাকে।

ভ্যাট! অমন করে তাকিও না। ভয় করে। তোমার সেই দুষ্টুমি আজও গেল না, তাই।

গোকুলবাবু লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়েছিলেন। ফের তুললেন।

চল। ও ঘরে যাই। মন ভালো নেই আজ।

কেন?

আরে, বোলো না! গাঙ্গুলিমশাই বারবার ডেকে পাঠাচ্ছেন।

বেশ তো! যাও না। বিয়েটা করেই ফেলো। মন্দ কী?

আর তুমি?

আমি মানে? কী বলতে চাও, শুনি?

তুমি আমার কী, তাও কি টের পাচ্ছ না এখনও?

গোকুলবাবু পুনশ্চ হেঁটমুণ্ড হলেন। গুরুজন তো বটে। বাপের বয়সী মানুষ। শোনো, তোমাকে আমার এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপারটা আজ ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চাই। বসো। তোমায় বোঝানো দরকার। মন দিয়ে শুনে যাও। বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করো। কেমন?

একটা ফাইল আনল। তারপর পড়া শুরু হল।

...ক্যান্সারের মূলে আছে কয়েক রকম জীবাণু। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক যেটি, তার নাম আর. এস. ভি অর্থাৎ রাউস সারকোমা ভাইরাস। মার্কিন জীবাণু-বিজ্ঞানী পেটন রাউস প্লাইমাউথ অঞ্চলের একটি পাহাড়ি মুরগীর টিউমার থেকে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে এটি শনাক্ত করেন। এর আয়তন বা ব্যাস একের আড়াইলক্ষ ইঞ্চি। এই আর. এস. ভি'র মধ্যে কিছু নিউক্লিক অ্যাসিড,

প্রোটিন আর লিপিডের সূক্ষ্ম আবরণ। অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বংশবৃদ্ধি দ্বারা কোষে কোষে সংক্রামিত হতে থাকে। প্রত্যেকটা গড়ে তোলে একটা করে স্তূপাকৃতি রূপান্তরিত কোষ বা 'ফোসি'। সেগুলো গুণে দেখাও সম্ভব। মুরগীর দশলক্ষ কোষবিশিষ্ট একটা অংশে প্রচুর আর. এস. ভি ইঞ্জেকশন করে দেখা গেছে, এ কিন্তু অন্য জীবাণুর মতো গৃহস্থ কোষটিকে ধ্বংস করছে না, তার বাইরে বসে বংশবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। অর্থাৎ, গৃহস্থ কোষটির কোনো রূপান্তর ঘটছে না। এর কারণ কী? নিশ্চয় কোষে কোনো প্রতিরোধী শক্তি আছে। এর নাম দেওয়া হল রাউস ইনডিউসিং ফ্যাক্টর, আর. আই. এফ।

গোকুলবাবুর মাথা ঘুরতে লাগল। বাপ্‌স্‌। ওদিকে মৌতাতের সময় হুহু করে বয়ে যাচ্ছে। যথেষ্ট জ্ঞান বাড়ল। এবারে কেটে পড়া যাক্‌। তবে কথা কী, এমন মহৎ কাজে শ্রীমান নির্বোধের মতো মুরগী চুরি করতে যাচ্ছে কেন? তাঁকে গোপনে বললেই তো চুকে যায়।

তাছাড়া আর কিছুদিনের মধ্যেই তো শ্বশুরের পোলট্রি হাতে এসে যাবে। বোকা! বোকা! বোকা! আসলে ওটা ছেলেবেলার সেই বদ অভ্যাস। যা দুঁদে খচ্চর ছেলে না ছিল! যা সহজে হবে, তা জটিল না করে ছাড়ত না। কম জ্বালাতো গোকুলবাবুকে? কথায় বলে, স্বভাব যায় না মলে!

সদর দরজা হয়ে চলে যাবেন ভাবলেন। এবং পা বাড়াতেই আছাড় খেলেন অন্ধকারে। নিজের অজান্তে চেঁচিয়ে উঠলেন, গেছি গেছি গেছি রে বাবা! উহু-হু-হু! অরুণ! অরুণ! আমাকে ওঠাও!

অমনি টর্চের আলো এসে পড়ল। গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন গোকুলবাবুই। অরুণ হতভম্ব। তারপর একটানে তুলে ঘরে ঢোকাল। টেবিলে শুইয়ে দিয়ে, বলল একটা শর্ত গোকুলদা। এই দেখছেন মুরগীকাটা ছুরি। যা দেখলেন বা জানলেন, যদি ফাঁস হয় তাহলে...

গোকুলবাবু ভয়ার্ত মুখে বললেন, না না। আমার ঠ্যাংটা দেখ—গেছে। নির্ঘাৎ গেছে! উহু-হু-হু।

উত্তরা আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। আর হাসি চাপতে পারল না। হিহি করে হেসে উঠল। গোকুলবাবু যন্ত্রণা ভুলে হেঁড়ে গলায় চেঁচালেন, হাসছ? হাসবে বইকি! তোমার তো হাসির দিন! এদিকে আমার—উহু-হু-হু...

অরুণ পা পরীক্ষা করতে করতে বলল, সাবধান গোকুলদা। স্পিকটি নট।

ক'দিন ধরে পায়ে ব্যান্ডেজ নিয়ে খুঁড়িয়ে চলছেন গোকুলবাবু। জিগ্যেস করলে বলেন, চোর ধরতে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটেছে। উত্তরা দেখলেই ফিক করে হেসে ওঠে। তখন গোকুলবাবু তাকে শাসান। উত্তরা তখন কপট খোশামুদি করে।—আমার সোনার ছেলে গোকুলকাকা। বড্ড ভালো ছেলে।

কারণ, অরুণ বলেছে ওকে একটু সামলাতে হবে। নৈলে বিপদ।

তারপর দীননাথ ফিরলেন। ক্ষমাও এসে গেলেন। কুকুর নিয়েই এসেছেন দীননাথ। একটা দুটো নয়, বাহিনী বলা যায়। চারটে তরুণ বয়সী টেরিয়ার। সঙ্গে ট্রেনার ইউসুফ খাঁ। খামার বাড়িতে হইচই পড়ে গেল। কুসুমপুরের অনেকে এসে দেখে গেল ব্যাপারটা। দীননাথ সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, এবার মুরগী চোরের কান যাবে, আস্ত একটা করে কান। খাঁটি বিলিতি শিকারী কুকুর। ফাদার-মাদার বলতে দেবে না।

গোকুলবাবু খোঁড়াচ্ছেন দেখে বললেন, তোমার হাতে বন্দুক দিয়েছি কেন ভেবেই পাইনে। বন্দুক ফেলে দৌড়াতে গিয়েছিলে? আহাম্মক কোথাকার! বন্দুক দাঁড়িয়ে ছোড়ে, নাকি দৌড়তে দৌড়তে ছোড়ে? অ্যাঁ এবার আমি নিজে বন্দুক ছুড়ব। দেখি কেমন করে গুলি ফস্কায়।

বিকেলে দীননাথ কুকুর বাহিনী এবং বন্দুক কাঁধে নিয়ে গাঙ্গুলিবাড়ির সামনে দিয়ে গেছেন। গাঙ্গুলি অ্যান্ড সন্স হয়ে গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরে ফার্মে ঢুকেছেন। গাঁয়ের নেড়িকুত্তারা প্রচুর চেঁচামেচি করেছে। সন্ধ্যা অব্দি সেই চেঁচামেচির আওয়াজ আবছা শোনা যাচ্ছিল।

রাতে মুরগীর খাঁচার কাছে চারটে টেরিয়ার ছাড়া থাকবে। গরমের মাস। ফাঁকা জায়গায় খাটিয়া পেতে ইউসুফ খাঁ ট্রেনার শোবে। দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে বন্দুক ছুড়বেন দীননাথ—টর্চে নতুন ব্যাটারি এনেছেন। আর চোরের পক্ষে পা বাড়ানো সম্ভবই নয়।

এসব নিয়ে দিন কাটছে দীননাথের। ওদিকে ক্ষমা তাঁকে দিয়ে জব্বলপুরে অরুণের মামাকে চিঠি লিখিয়েছেন। গাঙ্গুলিরা এগিয়ে আসার আগেই ছোঁ মেরে তুলে নেবেন অরুণকে। থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে বেজা গাঙ্গুলির—দীননাথ বলেছেন। সব কথাবার্তা চুকে গেলে শুভ কাজ কলকাতার

বাড়িতেই হবে—ক্ষমা বলেছেন। দীননাথের তাতে আপত্তি—না, এখানেই হবে। ওদের চোখের সামনে হবে। বাড়ি রং করাব, কলকাতা থেকে মিস্তিরি আনব। ডিজাইনকে ডিজাইন বদলে দেবো। চোখ জ্বলে যাবে বেজার।

এক সকালে গোকুলবাবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে গেছেন অরুণের কাছে। অরুণ বেরিয়ে এসে বলল, আরে! আপনি এখনও খোঁড়াচ্ছেন? কী অবাক! কই দেখি, সোজা হয়ে হাঁটুন তো। হাঁটুন।

গোকুলবাবু হইচই করে উঠলেন। অরুণ ওঁর পা ধরে টান দিয়ে বলল, হাঁটুন তো! দেখবেন, দিব্যি হাঁটতে পারছেন। বাঃ! এই তো। লেফ্‌ট রাইট করুন। লেফ্‌ট রাইট।

তখন দেখা গেল গোকুলবাবু সত্যি হাঁটতে পারছেন। ক্রমশ লেফ্‌ট রাইট—মার্চ, তারপর এপাশ ওপাশ পা ছোড়াছুড়ি করে একগাল হাসলেন।—আসলে মনের আতঙ্ক। বুঝলে অরুণ? হ্যাঁ শোনো। যা বলতে এলুম। ভেরি সিরিয়াস ব্যাপার। মাইন্ড দ্যাট।

করুণ হেসে অরুণ বলল, সিরিয়াস সে আর আপনি বলবেন কী, আমি অলরেডি টের পেয়ে গেছি। ইস। ভাবা যায় না। সত্যি, ভাবা যায় না। গোকুলবাবু বললেন, যা বলেছ। একেবারে ধুন্ধুমার কাণ্ড। চার-চাট্টে যোয়ান কুত্তা চনমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরে, আমিই ঘর ছেড়ে বেরোতে পারছিনে! ও সায়েবজাতকে তো বিশ্বাস নেই। এই তো সক্কালবেলা বেরোচ্ছি, আড় চোখে তাকিয়ে দেখি আমার দিকে জুলজুল চোখে তাক করছে। বাপস্! হার্ট ধুকধুক করছিল, বিলিভ মি। দেখ এখনও প্যালপিটেশান—

আপনার চেঙ্গিস খাঁয়ের অবস্থা কী, বলুন তো? তাড়া করে না ওকে? করে না? বলছ কী অরুণ? ওদের জ্বালায় বেচারা আম গাছের ডগায় গিয়ে চড়েছে তো চড়েইছে। আর নামলই না। ট্রেনার ব্যাটাকে বললুম, দেখো খাঁ সাহেব, আমার এই মোরগের কোনো ক্ষতি হলে আমি তোমার নামে মামলা করব।

অরুণ একটু চুপ করে থেকে উদ্বিগ্ন মুখে বলল, এদিকে আরেক সমস্যা। বলুন তো গোকুলদা, কী করি। আপনার পাকা ব্রেন। একটা বুদ্ধি বের করুন তো।

গোকুলবাবু সিরিয়াস হয়ে নড়েচড়ে বসলেন।—হুম, বলে যাও।

ওই যে যন্ত্রটা দেখছেন, কেনার জন্যে হাজার পাঁচেক টাকা ধার করেছিলাম গাঙ্গুলিমশাইয়ের কাছে। বাবার বন্ধু। ভেবেছিলুম, ওঁর কাছেই বলা যেতে পারে। যাই হোক, টাকা তক্ষুণি পেয়েছিলুম। যন্ত্রটা কিনে আনলুম। কাজ শুরু

করা গেল। তারপর হঠাৎ গাঙ্গুলিমশায় ইনডাইরেক্টলি প্রস্তাব দিলেন...হুম! বলো, বলো।

ওঁর কনিষ্ঠা কন্যার পানিগ্রহণ করতে হবে।

কনিষ্ঠা কন্যার পানিগ্রহণ! বাঃ! বেশ। তারপর?

দেখুন, সত্যি বলতে কি, বিয়ে-টিয়ের ব্যাপার আমার মাথায় নেই। একেবারে নেই। আমার মাথায় এখন...ক্যান্সার। হাঃ হাঃ হাঃ।

এ্যাঁ? অরুণও হেসে ফেলল।—হ্যাঁ, মানে ক্যান্সারের ভাইরাস! সুতরাং ওঁদের যথাসাধ্য এড়িয়ে চলছিলুম। স্পষ্ট করে হ্যাঁ বা না কিছু বলিনি। কারণ ওই টাকার ব্যাপারে অবলিগেশান ছিল। তারপর সম্প্রতি চৌধুরীমশায়ের বাড়িতে আমার যাতায়াত ইত্যাদি দেখেই হয়তো গাঙ্গুলিমশাই কিছু আঁচ করেছেন। এখন প্রায় ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করেছেন।

ব্ল্যাকমেইল! বল কী হে অরুণ? এ যে দস্তুরমতো ক্রাইম!

তাই তো! হয় টাকা সুদ সুদ্ধ ফেরত দিতে হবে, নয়তো...

নয়তো ওঁর মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। কেমন? গোকুলবাবু হাসি মুখে মাথা দুলিয়ে বললেন, দেন দি প্রবলেম ইজ জল, মানে ওয়াটার!

ওয়াটার?

আলবৎ, ওয়াটার। তরল পদার্থ স্রেফ!

বুঝিয়ে বলুন গোকুলদা! আমার মাথা গোলমাল করছে।

আরে, এ তো শুধু জল নয়, ডাল ভাত। গিলে ফেলার ওয়াস্তা। তুমি একটা প্রশ্নের জবাব দাও আগে। উত্তরাকে তুমি লাইক করো, না করো না?

অরুণ একটু হেসে মাথা দুলিয়ে বলল, ধরুন করি।

উঁহু-হু! ধরব কেন? স্ট্রেইট বল। দেয়ার ইজ নাথিং রং ইন ওয়র অ্যান্ড লভ। তুমি উত্তরাকে বিয়ে করে ফেলো। ব্যস।

ফেললুম। কিন্তু গাঙ্গুলির টাকা?

গোকুলবাবু উচ্চহাস্য করে বললেন, তোমার মাথাটা ওই আর. এস. এস না আর. এস. পি বিগড়ে দিয়েছে হে অরুণ।

ওটা আর. এস. ভি গোকুলদা। রাউস সারকোমা ভাইরাস।

তাই হল। শোনো, কত টাকা বললে? পাঁচ হাজার? হুঁ! মোটে পাঁচ? ওবেলা তোমার টাকা এসে যাবে। গিন্নির কাছে এক্ষুণি আমি কথাটা তুলছি!

অরুণ শশব্যস্তে বলল, আহা হা! আপনি বুঝছেন না গোকুলদা, সে কিছুতেই সম্ভব নয়। কেন ওঁদের টাকা আমি নেবো, শুনি?

বাঃ! যৌতুক নেবে। আগাম যৌতুক। বরপণ দিতে হবে না?

অসম্ভব। বরপণ কেন নেবো বলুন তো? এ যে আরও বে-আইনি।

আরে ভায়া, এ যে তোমার মুক্তিপণ, তা বুঝছ না কেন?

না গোকুলদা, সে আমি পারব না।

গোকুলবাবু একটু ভেবে বললেন, বেশ, ধার নেবে। স্রেফ লোন। লোন নিয়ে লোন শোধ করবে। হল তো?

অরুণ গম্ভীর হয়ে বলল, তাও হয় না গোকুলদা। ওঁদের কাছে এখন লোনের কথা তোলা অসম্ভব। আগে হলে বরং কথা ছিল। এখন আর তা হয় না।

তুমি ভাবছ কেন? কৌশলে আমি তুলব কথা।

অরুণ জোরে মাথা দোলাল।—তা হয় না, গোকুলদা।

তাহলে তুমি কী করবে, শুনি?

অরুণ বলল, ভাবছি। কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। হয়তো শেষ অব্দি...

শেষ অব্দি গাঙ্গুলির মেয়েকেই বিয়ে করবে। তাই তো?

অরুণ ব্যস্ত হয়ে বলল, না না! পাগল না মাথা খারাপ! ভাবছি শেষ অব্দি...গোকুলবাবু তাকালেন। ঘোলাটে চোখে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকলেন। অরুণ থেমে গেল তো গেলই। আর সে কথা তুলল না। অন্য কথায় এলো। বলল, কিন্তু আমার যে শিগগির একটা ওই জাতের বাচ্চামুরগী দরকার গোকুলদা! কাছাকাছি যেখানে যেখানে পোলট্রি আছে, বেগতিক দেখে খুব খোঁজখবর করে বেড়ালুম। কোথাও নেই। ওটা বিশেষ এক জাতের পাহাড়ি মুরগী। চৌধুরীমশাই ডিম আনিয়েছিলেন হরিয়ানা থেকে। তাই না?

গোকুলবাবু বললেন, হ্যাঁ। ওই ডিম ফোটাতেই তো সাইক্লোট্রন কিনেছিলেন। বাইশটা বাচ্চা হল তার দশ-বারোটা তো তুমিই মেরে দিলে। এখন আছে মোটে ন'টা। একটা-দুটো এমনি মারা পড়েছে।

একটা কোনো ভাবে ম্যানেজ করা যায় না?

অরুণ এমন আদুরে স্বরে গোকুলবাবুকে জড়িয়ে ধরল যে উনি নিমেষে গলে গেলেন। বললেন, আজই চাই?

আজই। কারণ এক্সপেরিমেন্ট আধখানা এগিয়ে রয়েছে। মুরগীটা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মারা পড়ল যে! গোকুলদা, প্লিজ হেল্প মি। উত্তরাকেও বলেছি। তার আবার মুরগীর ব্যাপারে প্রচণ্ড এলার্জি। দেখলেই শিউরে ওঠে। তাই সে আপনার কথাই বলেছে।

গোকুলবাবু উদাত্ত স্বরে বললেন, তুমি আদর্শব্রতী বিজ্ঞানী। দেশের সু-সন্তান। তোমার এই মহৎ প্রচেষ্টায় অবশ্যই সাহায্য করা উচিত। সমগ্র মানবজাতির যাতে কল্যাণ হবে, তার জন্যে এই গোকুলের জীবনটাই যায় তো যাক্ না।

অরুণ ওকে জড়িয়ে ধরে উত্তরার ভঙ্গীতে বলল, আমার প্রাণের গোকুলদা? সোনা ছেলে! লক্ষ্মী ছেলে।

বিকেলে টেরিয়ারগুলো নিয়ে ট্রেনার ইউসুফ খাঁ গেছে নদীর ধারে, নিছক ভ্রমণে। দূর থেকে দীননাথ তারিয়ে তারিয়ে দেখেছেন। তারপর ফার্মে ঢুকেছেন। হঠাৎ চোখ গেল সব্জীক্ষেতের ওদিকে। গোকুলবাবু অমন চুপি চুপি কেন যাচ্ছেন? ভঙ্গীটা প্রচণ্ড সন্দেহজনক।

পরমুহূর্তে হতভম্ব হয়ে দেখলেন, গোকুলবাবুর হাতে একটা মুরগী। অমনি তাঁর চৈতন্যোদয় হল বলা যায়। এ কী দেখছেন! তাহলে ওই আফিংখোর লোকটাই অ্যাদ্দিন...

হ্যাঁ। তাই। ওকে আজ হাতেনাতেই ধরতে হবে। চুপি চুপি এগোলেন দীননাথ। নিশ্চয় মারতে নিয়ে যাচ্ছে ব্যাটা। মেরে চামড়া ছাড়িয়ে মাংসটা নিয়ে আসবে। গোপনে রান্না করে খাবে। রোসো, চরম মুহূর্তে গিয়ে দেখাচ্ছি মজা! হাতে নাতে পাকড়াও করবো, তারপর ইন্দ্র দারোগার কাছে চালান। আর দেখতে হবে না।

ঝোপের আড়ালে আড়ালে এগোচ্ছেন গোকুলবাবু। ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়ে ওপাশে অদৃশ্য হতেই দীননাথ দৌড়লেন। কিন্তু ওপাশে তাকে আর দেখতে পেলেন না। জঙ্গলে ভর্তি জায়গাটা। দীননাথও পাঁচিল ডিঙিয়ে চলে গেলেন। একটু পরেই শুনতে পেলেন কঁক্ কঁক্...কোঁও! আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন। বড্ড জঙ্গল। কিন্তু মাথায় খুন চেপে গেছে। ব্যাটার বরাত ভালো যে দীননাথের হাতে এখন বন্দুক নেই। বুদ্ধি করে একটা পাটকেল তুলে নিলে। পোড়ো ভিটে। তাই অজস্র পাটকেল পড়ে রয়েছে! শুকনো পাতার আওয়াজ পাচ্ছিলেন। অথচ দেখা যাচ্ছে না ওকে। তারপর আবার শোনা গেল কঁক্-কঁক-ক্রোঁ-ক্রোঁ-ক্রোঁ...

তার মানে সংঘাতিক কিছু ঘটছে। পাগলের মতো ছুটে চললেন দীননাথ। আছাড় খেলেন কয়েকবার। পাঞ্জাবি ছিঁড়ে গেল। কাঁটা ফুটল। তাতেও গ্রাহ্য

নেই। হঠাৎ দেখেন সামনে পাঁচিল। আরে! এ তো বাঁড়ুয্যেবাড়ি। গোকুলবাবু ঢুকল কোথায়? তক্ষুনি একটা চাপা আওয়াজ শোনা গেল, অরুণ! অরুণ! এনেছি! শিগগির!

দীননাথের মাথাটা গোলমাল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এর মানে?

তিনি কয়েকটা ইট কুড়িয়ে পাঁচিলের ধারে রেখে রাগে কাঁপতে কাঁপতে তার ওপর দাঁড়ালেন এবং মুণ্ডু বাড়ালেন। তখন বাকিটা পরিষ্কার হল। ওরে বিশ্বাসঘাতক! সারাজীবন নুন খেয়ে এই গুণের পরিচয় দিলি অবশেষে? এ যে স্বপ্নেও ভাবা যায়নি! দীননাথ দৃশ্যটা আর সহ্য করতে পারলেন না। রাগে দুঃখে অনুশোচনায় তাঁর হৃদয় অস্থির হল। কিন্তু কিছু করার আগেই পা হড়কে পড়ে গেলেন।

যখন উঠলেন, তখন মানুষ সম্পর্কে তিনি এক মোহহীন নির্বিকার পুরুষ। বৈরাগ্যে আচ্ছন্ন। মাতালের মতো টলতে টলতে রাস্তায় উঠলেন। সবকিছু শূন্য দেখাচ্ছিল তাঁর দৃষ্টিতে। হ্যাঁ, বহু অর্থব্যয়ে শ্রমে-প্রযত্নে কীভাবে না হরিয়ানায় গিয়ে ওই দুর্লভ পার্বত্য কুক্কুটের অণ্ড সংগ্রহ করেছিলেন! সে সংগ্রহ অভিযানের বিবরণ বড় রোমাঞ্চকর। কর্নেল বরেন্দ্র যশপাল নামে যে ভদ্রলোকের মুরগীখানায় ও বস্তু ছিল, তিনিও শখের জন্যেই আমেরিকা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। পয়সার বদলে দিতে চাননি। তখন ওঁর চাকরকে ঘুষ দিয়ে রাতের দিকে চুরি করানো হয়েছিল। ধরা পড়লে কি যে হত! যাই হোক, সে আলাদা কাহিনি। এই প্রজাতির মুরগী দীননাথ নিছক ব্যবসার উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করেননি। স্রেফ শখ। এবং ওই গোকুলবাবু তা বিলক্ষণ জানেন। জেনে-শুনেও এমন কাজ করতে পারলেন। এর চেয়ে তাঁর বুকে ছুরি মারলেও তিনি এমন ক্ষুব্ধ হতেন না।

সবচেয়ে দুঃখের কথা, যাকে আজ বাদে কাল জামাই করা হবে, সে-ই কি না এতদিন ধরে মুরগীগুলো চুরি করে এসেছে এবং গোকুলবাবুর সাহায্যেই করেছে। কেন না রাতে যখনই মুরগী চুরি হয়েছে, গোকুলবাবুকে ঘটনাস্থলে দেখা গেছে। অতএব চুরিটা স্বহস্তে অরুণই করেছে। নিশ্চয় ওই জাতের মুরগীর মাংস অতি উপাদেয়। নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। হরদম খেতে ইচ্ছে করছে। ডিডাকশান পদ্ধতিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন দীননাথ।

দোতলায় যখন উঠলেন, ক্ষমা তাঁকে দেখে হাঁ করে তাকালেন। ইশারায় দীননাথ জল খেতে চাইলেন!

ক্ষমা শিউরে উঠে বলনেল, কী? কি হয়েছে তোমার? উত্তরা! উত্তরা! শিগগির জল দিতে বল্ হারাধনকে। উত্তরা! কথা কানে যাচ্ছে না?

ক্ষমা একটু চেঁচামেচিই করলেন। তার ফলে নীচ থেকে কেউ কেউ দৌড়ে এলো। উত্তরা উদ্বিগ্ন ভাবে নিজেই জল এনে দিল। বারান্দায় পাখা নেই। অগত্যা খুঁজে হাতপাখা আনা হল। ক্ষমা বাতাস করতে থাকলেন। দীননাথ জলটা ঢকঢক করে খেলেন। তারপর আচমকা ফেটে পড়লেন।

—ফার্স হচ্ছে? ফার্স দেখতে এসেছ তোমরা? গেট আউট? গেট আউট নেমক হারামের দল! কাউকে রাখব না। সবাইকে ডিসমিস করব। বেইমান! সব বেইমান।

এই বাজখাঁই চেঁচানি শুনে লোকগুলো তক্ষুনি ভয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে কেটে পড়ল। ক্ষমা তাকিয়ে ছিলেন মুখের দিকে। যখন দেখলেন, স্ট্রোক-টোকের ব্যাপার নয়, তাঁরও অমনি রাগ হল। হবে না? বলা নেই কওয়া নেই, বাইরে থেকে এসে এই আদিখ্যেতার মানেটা কী? ঠক করে পাখাটা মেঝেয় ফেলে বললেন, চেঁচাচ্ছ কেন? হলটা কী?

দীননাথ ফাটতে শুরু করেছেন ক্রমশ।—বেইমান! সব বেইমান! দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা হয়েছে, বুঝেছ? সবার আগে ওই গোকলোটাকে তাড়াব। তারপর বাকি সবাইকে। কাকেও রাখব না। তুলে দেবো ফার্ম। আগুন ধরিয়ে দেবো। উচ্ছন্নে যাক। আমার নবডঙ্কা।

ক্ষমা বাঁকামুখে বললেন, আমারও নবডঙ্কা! ফার্ম তুলে দেবে—দাও না। তাই বলে আমার সামনে ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছ কেন?

চেঁচাব না? দীননাথ ভাঙা গলায় বলে উঠলেন, কী হয়েছে জানো? গোকুল কী করেছে খবর রাখো? আর তোমার ওই চাঁদমুখো গুণনিধি বাঁড়ুয্যে গোপাল অ্যাদ্দিন ধরে আমার যে বারোটা বাজিয়ে আসছে, সে খবরও কি রাখো? কে আমার মুরগীগুলো রাতের পর রাত চুরি করে খেয়ে মৌজ করছে জানো? তুমি তো এদিকে রংমহল বানিয়ে বসে আছ!

ক্ষমা অবাক হয়ে বললেন, কে কী করেছে?

দীননাথ ওঁর মুখের কাছে হাত নেড়ে বললেন, তোমার বাছাই করা হবুজামাই।

অরুণ মুরগী চুরি করেছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমার অরুণচন্দ্র। হুঃ ডাক্তার! ডাক্তার না ফাকতার! হাতি, হাতি! সব জাল কোয়ালিফিকেশন! বাইরে অমন ঢের জোগাড় করা যায়।

আরে, আসলে বংশের ধারা যাবে কোথায়? ওরা সাতপুরুষ ধরে আমাদের জ্বালিয়ে এসেছে। ও নিজেও কি কম জ্বালানোটা জ্বালাত?

ক্ষমা জিভ কেটে বললেন, চুপ চুপ! আর জানাজানি কোরো না। জোয়ান বয়সে অমন দুষ্টুমি সবাই করে। তোমার লজ্জা করা উচিত, সামান্য মুরগীর জন্যে এমন হইচই শুরু করেছ। ধিক তোমাকে! আজ বাদে কাল যাকে...

দীননাথ বাধা দিয়ে গর্জালেন, নেভার! কক্ষনো না! ওই মুরগীচোরকে জামাই করব! আমার গলায় দড়ি জুটবে না? ছ্যা ছ্যা ছ্যা!

ক্ষমা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি নির্ঘাৎ পাগল হয়েছ। বলছ কী সব? কাল অরুণের মামা আসছেন, সব ঠিকঠাক। তাঁকে বলবে কী?

ভেঙে দাও! আমি প্রাণ থাকতে ওই বেলেল্লা মাস্তানের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবো না। বলে দীননাথ সিঁড়ির দিকে এগোলেন। আপন মনে আবার বললেন, এখন দেখি সেই গোকলোটার কী ব্যবস্থা করা যায়। বেইমান! বিশ্বাসঘাতক!

ক্ষমা স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন। উত্তরা এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে সব শুনছিল। একটু হেসে বলল, মা, তুমি ও নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না। ব্যাপারটা আমি বুঝিয়ে বলছি।

ক্ষমা নির্বিকার মুখে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, আমি বুঝব না।

আহা, শোনোই না।

আমি শুনবো না।

উত্তরা এবার চটে গেল। বলল, তবে কী করবে?

আমি চলে যাবো।

চলে যাবো মানে?

চলে যাবো!...বলে ক্ষমা দুমদাম পা ফেলে ঘরে ঢুকলেন। ব্যস্ত হয়ে কাপড়-চোপড় গোছাতে শুরু করলেন। সেই সঙ্গে আপন মনে বলতে থাকলেন, আমার কথার কোনো মূল্য নেই? আমি কি এতই পর? মেয়ে আমি পেটে ধরিনি, তবে কি ও নিজে ধরেছিল? যে সংসারে আমার কোনো কথা খাটে না, সেখানে আমার থাকা উচিত? মোটেও না। তেমন বাবার মেয়ে এই ক্ষমা নয়। বলে, ভেঙে দাও। দিতে হয়, তুমি নিজেই দিও। এই আমি চললুম দেখি কে আমায় ঠেকায়!

তারপর বেরিয়ে এসে বারান্দা থেকে ডাকলেন, হারাধন! হারাধন! বিপিনকে বল, গাড়ি বের করুক। আমাকে যেখান থেকে এনেছে ভালো ছেলের মতো যেন সেখানেই আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসে।

উত্তরা জানে, এখন আর কোনোমতে মাকে ফেরানো যাবে না। সে দাঁড়িয়ে

রইল কিছুক্ষণ। কানে গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ ভেসে এলো সে ঠোঁট কুঁচকে একটা ভঙ্গী করল—অর্থাৎ মরুক গে, যার যা খুশি করুক। আমি কোনো সাতে-পাঁচে নেই, ব্যস।

দীননাথ গোকুলবাবুকে পেলে তো একটা কিছু করবেন। উনি বেমালুম অদৃশ্য। রাঘব অরুণের কাছে গেছে। গোকুলবাবুর খোঁজ করেছে। অরুণ নির্বিকার মুখে বলেছে, এসেছিলেন বটে, ওষুধ নিয়ে চলে গেছেন তক্ষুণি। লুকিয়ে রেখেছি নাকি, খুঁজে দেখে যাও। রাঘবের কি অত সাহস আছে? এসে সে বলেছে বাবুমশায়কে, সব পইপই করে খুঁজলুম। নেই। তল্লাটেই নেই।

লোকজন পাঠিয়ে কুসুমপুর তোলপাড় করেও তাঁর পাত্তা মেলেনি। চেঙ্গিস খাঁ বেচারা প্যাটপ্যাট করে তাকাচ্ছে আর মাঝে মাঝে মোগলোচিত চিৎকারে ডেকে উঠছে। দীননাথ ধমকাচ্ছেন, শাট আপ বেইমানের বাচ্চা! ট্রেনার ইউসুফ খান আড়চোখে প্রথম দিন থেকেই তারিয়ে তারিয়ে দেখছে মোরগটাকে। সব জেনেও তার একই প্রশ্ন ইয়ে কিস্‌কা মোরগা হ্যায়? লোনায় জল নিয়ে অপেক্ষা করছে সে। বাবুমশায় চরম নোটিস দিয়েছেন, আর একটা দিন দেখব। তারপর গোকুলচন্দ্রের দরজা বন্ধ। ইউসুফ সময় গুনছে। মোরগটা ডেকে উঠলেই মুচকি হেসে বলছে, ক্যা বোলতা সমঝতা তুমলোগ? বোল্‌তা, মুঝে কোতল কর দো! শুনো, শুনো।

ওদিকে জব্বলপুর থেকে অরুণের মামা প্রমথেশের আসবার কথা ছিল সেদিন। দীননাথ খুব কড়া কথা তৈরি করেই অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু মুখোমুখি কিছু বলার সুযোগই পেলেন না। খবর পেলেন, ভাগ্নে আসতে দেয়নি মামাকে। কুসুমপুর জুড়ে তার নামে কেলেঙ্কারি রটিয়েছেন দীনু চৌধুরি। তারও তো রক্তমাংস আছে শরীরে। দাশবাবু কম্পাউন্ডার বাকিটা শুনিয়ে গেলেন। প্রমথেশ গাঙ্গুলিবাড়ির আতিথ্যে আছেন, খবর পেয়ে ব্রজকিশোর নাকি তাঁকে জোর করে নিজের বাড়ি নিয়ে যান। কথাবার্তা সব পাকা। সামনের ম্যাসেই বিয়ে। অরুণ? অরুণ রাজি না হয়ে পারে? মামাই তো তাকে মানুষ করেছেন। ডাক্তারি পড়েছিল কার টাকায়?

দীননাথ ক্লান্ত ভাবে বসেছেন, চোরচোট্টা স্মাগলার ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ারদের এমন কুটুম্বিতা তো স্বাভাবিকই। কথায় বলে, যে যেমন তার কুটুম তেমন। কিন্তু গোকুলবাবু কোথায়? ক্রমশ একটু ভাবনায় পড়ে যান দীননাথ। আফিংখোর

মানুষ। মনের দুঃখে আত্মহত্যা করে বসেননি তো? সেই হাফ পেন্টুল-পরা বয়স থেকে এ বাড়িতে রয়েছেন। মায়া-মমতা হওয়া স্বাভাবিক দীননাথের পক্ষে। উৎকণ্ঠিত হতে থাকেন দীননাথ। না হয় বদমাইশের প্ররোচনায় পড়ে কাজটা করেই ফেলেছে, তাই বলে সামনে এলে কি দীননাথ সত্যি সত্যি কিছু একটা করে বসতেন? প্রতিদিনই ভাবছেন, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখব নাকি?

ইদানীং আরেক ব্যাপারে দীননাথের অবাক লাগে। আগে কোনো দাম্পত্য কলহ বা পারিবারিক বিসম্বাদে উত্তরা সব সময় হস্তক্ষেপ করেছে। এবার সে অদ্ভুত নির্বিকার ও নির্লিপ্ত। দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে, পাড়ার মেয়েরা এলে হেসে হেসে স্বাভাবিক কথাবার্তা ও আড্ডা চালিয়ে যাচ্ছে, নয়তো বরাবরকার অভ্যাস মতো আপন মনে তাসের পেসেন্স খেলছে। অরুণের সঙ্গে মেলামেশা কঠোর ভাবে বারণ করেছেন দীননাথ, তাও মেনে নিয়েছে। সবচেয়ে অবাক লাগে, সে আগে এসেই পালাই-পালাই করত, এখন কিন্তু ভুলেও বলে না যে একঘেয়ে লাগছে। পাড়াগাঁয়ে এমন ভাবে মন বসে যাওয়া তার মতো স্মার্ট এবং শহুরে জীবন অভ্যস্ত মেয়ের পক্ষে অস্বাভাবিক, তা দীননাথ টের পাচ্ছেন। গোপনে কোনো ষড়যন্ত্র করছে না তো উত্তরা? সব সময় তো মেয়েকে চোখে রাখার ফুরসত পান না। ফার্মের কাজে প্রচণ্ড মন দিয়েছেন। তার ওপর কুকুরের নেশায় ধরেছে এবার। টেরিয়ারগুলো বশ মেনেছে প্রকৃত প্রভুর। ওই নিয়ে ঘুরতে বেরোন। ইউসুফও সঙ্গে থাকে।

মাসের শেষে খামার বাড়িতে দুটো ঘটনা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল।

গোকুলবাবুর আদরের চেঙ্গিস খাঁ একদিন হঠাৎ অদৃশ্য হল। নবচরণ মালী তার কোঁ কোঁ চিৎকার শুনেছে স্পষ্ট। শেয়াল? অসম্ভব। মোরগটা অতিকায় এবং হিংস্র। তেমনি ধূর্ত। সব সময় গাছের ডালে ডালে ঘুরত। আর ভরদুপুরে শেয়াল আসবে কেন?

নবর বউ বলল, খাঁ সাহেবের ঘর থেকে মাংস রান্নার গন্ধ পেয়েছে গত রাতে। নবর মেয়েও নাকি দেখেছে, খাঁ সাহেব নদীর চরে একগাদা ডানা পুঁতছিল আজ ভোরবেলা। এখনও তার চিহ্ন দেখা যাবে।

ব্যস, এক কথায় ইউসুফ খাঁয়ের চাকরি গেল। গেল তো গেলই। দীননাথ জেদী মানুষ। তাঁকে বশ মানায় সাধ্য কার? ইউসুফ বিমর্ষ মুখে চলে গেল। ইদানীং তার ভুঁড়ি জমছিল। যাবার সময় বারবার কসম খেয়েছে, সে ওই মোরগটা খায়নি। খেয়েছে বটে, তবে সে দুসরা মোরগা। যাই হোক, লুকিয়ে

খাওয়া মানেই চুরি। দীননাথ বলেছেন, আভি গেটসে গেট আউট! কিন্তু ভেতর ভেতর দীননাথ যথারীতি আবার শূন্যতা বোধ করছিলেন। ক্ষমার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটিই করুন, আর যা-ই করুন মন থেকে তো কখনও তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখেন না। ভাবলেন, কৌশলে উত্তরাকে বলবেন কিছু। উত্তরার হস্তক্ষেপে ক্ষমার সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন সম্ভবপর। কিন্তু বড় বাধোবাধো ঠেকে আজকাল। মেয়ে তো আর কচি খুকিটি নয়।

অগত্যা দীননাথ অন্য পথ ধরলেন। গা ম্যাজ-ম্যাজ, অসুখ-বিসুখ, অনিদ্রা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বলেন, কেউ কারও না। এই জঙ্গলে জায়গায় পড়ে থেকে যদি হঠাৎ একটা কিছু হয়ে-টয়ে যায়, মুখে এক চামচ জল বলতে কেউ দেবে না। সব, সব শত্রু! এ লাইফের দাম নেই। উত্তরা ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। করবে বলেই দীননাথ এমন করছিলেন। এবং এতে কাজ হল। উত্তরা বলল, বাবা, আমি কলকাতা যাবো।

দীননাথ চাঞ্চল্য চেপে বললেন, যাবে? সে কী? তারপর হেসে বললেন, মায়ের জন্যে হঠাৎ মন খারাপ করল বুঝি? আমি কেউ নই, না?

উত্তরা বালিকার মতো ভঙ্গী করে বলল, ভ্যাট! এমনি। অবশ্য, মাকেও স্বপ্নে দেখেছে। দেখব না? আমার মা, আমারই মা। মন খারাপ করাটাও অস্বাভাবিক নয়। করা উচিত।

দীননাথ বললেন, কী মুশকিল! ইউ আর অলওয়েজ অ্যাট লিবার্টি! কবে কোথায় কখন তোমায় আটকেছি বলো? জাস্ট স্পিক দা ট্রুথ! বরং তোমার মা-ই কত সময় বাদ সাধেন! অবশ্য, বলবে, অরুণের সঙ্গে মেলামেশায় আমি...

উত্তরা চটে গিয়ে বলল, ভ্যাট! খালি অরুণ আর অরুণ! আমি যাচ্ছি। একা? না না। বিপিন যাক সঙ্গে।

মোটেও না। ও সারাপথ বকবকানিতে কান ঝালাপালা করে দেবে! তাছাড়া আমি তো একা একা নতুন যাওয়া আসা করছিনে বাবা! তোমার অত ভাবতে হবে না। তুমি তোমার দুর্লভ জাতের মুরগী পাহারা দাওগে! হাসতে হাসতে উত্তরা বেরুল। দীননাথও হাসি মুখে মেয়েকে হাত নেড়ে বিদায় দিলেন। বলে দিলেন, শিগগির ফিরে আসবি মা। নয়তো একা একা হাঁফিয়ে উঠব। যদি দেরি করিস, এসে দেখবি আমি তখন অক্কা!

উত্তরার গাড়িটা জোরে বেরিয়ে গেল। এরপর দীননাথের মুহূর্ত গোনার কাজ পড়ে যাবে। কান সব সময় তৈরি থাকবে, কখন আওয়াজ হবে প্রিঁ প্রিঁ প্রিঁ।

ওদিকে মোহনপুরের বাঁক ঘুরেই উত্তরা গাড়ি থামিয়েছে। বিশাল বট ডালপালা রাস্তার ওপর ছড়িয়ে ছায়া ফেলেছে। একটা ঝুড়িতে সাইকেল ঠেস দিয়ে অরুণ দাঁড়িয়ে আছে।

উত্তরা একটু হেসে বলল, কী? বিয়ের বাজার করতে যাচ্ছ বুঝি?

অরুণ কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ভ্যাট! বিয়ে না হাতি! মামার যত সব আজগুবি কাণ্ড। আরে, কী বিচ্ছিরি অবস্থা হয়েছে দেখো না। রীতিমতো ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে আমায়।

বাঃ, ব্ল্যাকমেইল কিসের? সুন্দরী বউ পাবে।

প্লিজ লালী, প্লিজ। অরুণ গাড়ির জানালায় ঝুঁকে এলো। আমি জানতুম, তুমি রাগ করবে। জানো, কত চেষ্টা করেছি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে, অথচ আশ্চর্য, তুমি একেবারে বাধ্য মেয়ের মতো ঘরবন্দী হয়ে রইলে!

আমি কী করব, শুনি?

বাঁচাবে। আমায় এই দুর্যোগ থেকে সসম্মানে উদ্ধার করবে।

তোমার বিয়ে তো ঠিকঠাক। আমি কী ভাবে বাঁচাব?

আশ্চর্য লালী, আশ্চর্য! তুমি কী নির্বিকার ভাবে কথা বলছ!

ওসব বুঝিনে। আমার সোজা যুক্তি—তোমার মত না থাকলে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হতই না।

মত মানে কী? মামা ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন...

উত্তরা গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বলল, বেশ তো! সরো। যেতে দাও।

অরুণ সরল না। বলল, তুমি আমায় ফেলে পালিয়ে যাবে? কিন্তু একটা পরামর্শ করা খুবই দরকার। অথচ তোমার সঙ্গে যোগাযোগই হচ্ছিল না। মিথ্যে বোলো না। অ্যাদ্দিন তুমিই আমাকে লুকিয়ে বেড়িয়েছ।

অসম্ভব! আমি তোমায় বোঝাতে পারব না।

থাক। বুঝতেও চাইনে। চলি।

অরুণ দরজা খুলে ঢুকে বসে পড়ল। বলল, না। তোমায় বুঝতেই হবে।

উত্তরা একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমার সাইকেল পড়ে রইল।

চুলোয় যাক। আজ একটা হেস্তনেস্ত না করে আমি নামব না।

উত্তরা আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে। সাইকেলটা ওপরে তুলে দাও।

একটু পরে সাইকেল মাথায় নিয়ে ল্যান্ডমাস্টার ধীরে এগোচ্ছে। উত্তরা হঠাৎ ঘুরে বলল, গোকুলকাকা কোথায় জানো?

অরুণ একটু হেসে বলল, জানি।

মানে তোমার কাছে?

হুঁ।

কেমন আছেন?

ভালো। চেঙ্গিস খাঁয়ের সঙ্গে ঘরবন্দী আপাতত। দেখা যাক, পরে কী ব্যবস্থা করা যায় ওঁর। আসলে যেমন ভীতু মানুষ, তেমনি গোবেচারা। আমার জন্যেই ওঁর এ অবস্থা। এত কষ্ট হয় আমার।

বাবার রাগ পড়ে গেছে। যেতে বলো। কোনো ভয় নেই।

বিকেলের বিস্তীর্ণ মাঠে পিচের রাস্তা এবার সোজা চলেছে দিগন্তের দিকে। গাড়িটা খুব আস্তে আস্তে গড়াচ্ছে। বস্তুত সব উত্তেজনা থিতিয়ে প্রশান্তি আসার এমন সময় আর হয় না।

উত্তরা দু'দিন পরে ফিরে এলো। মাকে নিয়েই ফিরল। কিন্তু ক্ষমার কীর্তি শুনে দীননাথ অভিভূত। উৎসাহিতও হলেন। বাঃ, এ তো মন্দ হবে না। বেজা গাঙ্গুলি নাকের ডগায় সানাই বাজিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবে, তাই তাঁকে শুনতে হবে চুপচাপ? সেদিনের কথা ভেবে মনে মনে নিরন্তর উত্যক্ত ছিলেন। ভেবেছিলেন, ওই দুটো-তিনটে দিন বরং কলকাতায় গিয়ে থাকবেন।

ক্ষমার বুদ্ধি-সুদ্ধির প্রশংসায় ফেটে পড়লেন দীননাথ। বড় চমৎকার প্রস্তাব এনেছেন ক্ষমা। উত্তরার মতো মেয়ের পক্ষে এমন পাত্র আর হয় না। স্বয়ং গুরুদেব যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন যে! উত্তরার ভাগ্য। গুরুদেব ভর্ৎসনা করে বলেছেন, তা অ্যাদ্দিন সেকথা বলতে হয় রে!

পাত্র বেহালাবাসী। দু-দুটো কারখানার মালিকের ছেলে। নিজেও ইঞ্জিনিয়ার, সাত বছর কানাডায় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছে। কারখানা চালাবার চেয়ে বড় বড় সরকারি প্রোজেক্টের কন্ট্রাক্টারিতেই তাঁর ঝোঁক বেশি। বাবা যেহেতু গুরুদেবের শিষ্য, আদেশ না মেনে উপায় নেই। পাল্টা ঘর। পাত্র-পাত্রীর ঠিকুজি কোষ্ঠিতেও রাজযোটক। ক্ষমা দীননাথকে জানাবার ফুরসত পেলে তো। গুরুদেবই আগ বাড়িয়ে সব কথাবার্তা বলেছেন। মেয়ের ছবি আগেই দেখানো হয়েছিল। উত্তরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে সশরীরে দেখেও গেল। পছন্দ মানে? পায় তো এক্ষুনি মাথায় করে তুলে নিয়ে যায়।

দীননাথ এসব শুনে এমন ব্যস্ত হলেন যে উত্তরার মতামতের দিকে নজরই

দিলেন না। পাত্রের ছবি এনেছেন ক্ষমা। একে ওকে দেখাচ্ছেন। কুসুমপুরের সমাজে মাখামাখি শুরু করেছেন। সবাই একবাক্যে বলেছে—এখানেই শুভকাজটা হোক চৌধুরীমশাই। চিরকাল আপনাদের সব শুভকর্ম পালাপার্বণ এ বাড়ি থেকেই হয়েছে। এর অন্যথা হলে চলে?

ব্রজকিশোর খবর পেয়ে মুচকি হেসেছেন। তাঁর মতে দীনু চৌধুরী চিরকাল গুলের রাজা। এক থাকলে ডাইনে পটাপট একগাদা শূন্য বসাতে ওস্তাদ। বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার! ফুঃ! চৌধুরীদের কত্তাবাবাও বিলেতের নাম শুনেছে? দেখবে সব ম্যাজিক।

শেষ অবধি সত্যি সত্যি সবটাই ম্যাজিক হয়ে উঠল। এবং বিয়ের দিনেই সেটা চাউর হল। ও পাড়ার গাঙ্গুলিবাড়িতে সানাই বাজছে, এ পাড়ার চৌধুরীবাড়িতেও বাজছে। আর বাজছে বাঁড়ুয্যেবাড়িতে। অরুণের মামা-মামী আত্মীয়স্বজন সবাই এসেছেন। বাড়ির জঙ্গল একেবারে সাফ। নতুন রং পড়েছে। লোকজন থইথই।

চৌধুরীবাড়িতেই প্রথম ম্যাজিক দেখা গেল। যথারীতি হাতে চেঙ্গিস খাঁ ও ছড়ি, মাথায় টুপি, ঢোলা পাতলুন পরা গোকুলবাবু উদয় হলেন। দীননাথ তাঁকে জাপটে ধরে বলে উঠলেন, গোকুল এসেছ! কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন? তুমি না এলে আমার সব আনন্দ ফাঁকা ঠেকছিল যে! এসো এসো! ওরে, গোকুলবাবুকে নিয়ে যা। ঠেসে খাওয়াবি! মুখে ঠেসে দিবি!

এটা বিয়ের আগের দিন বিকেলের ঘটনা। বিয়ের দিন সকালে ঘটল দ্বিতীয় ম্যাজিক। উত্তরা নেই। রাতারাতি অদৃশ্য। চিঠি লিখেছে : আমার জন্যে ভেবো না। কলকাতা যাচ্ছি।

এর মানেটা কী? দীননাথ বজ্রাহত। ক্ষমার মুখ শুকিয়ে চূর্ণ। সারা বাড়ি ক্রমশ নিস্পন্দ হয়ে আসতে লাগল।

তৃতীয় ম্যাজিক ঘটে ব্যাপারটা জল হয়ে গেল। বাঁড়ুয্যেবাড়ি থেকে স্বয়ং অরুণও উধাও। একই ভাষায় চিঠি লিখে রেখে গেছে : আমার জন্যে ভেবো না। কলকাতা যাচ্ছি।

কুসুমপুরের চেহারায় বাইরে শহরের রং ধরলেও ভেতরে সেই গ্রামীণ ব্যাপারগুলো সনাতন। ক্রমশ জানাজানি হতে থাকল। হইচই পড়ে গেল। কেলেঙ্কারী অনেক দেখা গেছে, কিন্তু এমন কেলেঙ্কারী কেউ কল্পনাও করেনি। সবখানে সেই আলোচনা চলছে।

ব্রজ গাঙ্গুলি ক্ষেপে গিয়ে বলেছেন, সব ষড়যন্ত্র প্রমথেশেরই। ওর নামে মামলা করব। প্রমথেশ লজ্জায় ঘরে ঢুকেছেন তো ঢুকেছেন। বেরোতে পারছেন না। নোটনটা চিরকাল এমনি করে তাঁকে জ্বালাবে?

কুসুমপুরে ফোন নেই যে বেহালায় তক্ষুণি খবর পাঠাবেন দীননাথ। ওদিকে বিপিন এই বিপদের সময় জানিয়ে বসেছে—গাড়ি বিগড়েছে। কিছুতেই স্টার্ট নিচ্ছে না। তাকে গালমন্দ করে লাভ হল না। শেষ পর্যন্ত দীননাথ টেরিয়ার বাহিনী নিয়ে মনের দুঃখে গঙ্গার ধারে শ্মশানবটের তলায় গিয়ে বসলেন। যা হবার, হোক। ক্ষমা শুয়ে পড়লেন তো পড়লেন।

ননীবালারা সবাই এসেছে এ বাড়ি। সাধাসাধি করেও ওঠাতে পারল না গিন্নিকে। শুধু গোকুলবাবু আশ্বাস দিয়ে বেড়াচ্ছেন, পাত্রপক্ষ আসুক না। আমি ঠেকাবো।

ওদিকে গাঙ্গুলিবাড়ির অবস্থাও তাই। তবে একালের বড়লোক। দমে যাননি। ব্রজকিশোর ঊরুতে আঙুল ঠুকছেন আর ভাবছেন। মেয়ে লগ্নভ্রষ্টা হতে দেবেন না। প্রাণ গেলেও না। টাকায় সব কিছু সম্ভব, এই বলিষ্ঠ অভিজ্ঞতা তাঁর আছে।

দাশু কম্পাউন্ডার এসে হাই তুলে বললেন, চৌধুরীদের বরপক্ষ মোহনপুর অব্দি এসে গেছে। সেখানেই খবর পেয়েছে অবশ্য। কিন্তু ওঁরা বিশ্বাস করছেন না কথাটা। তাই আসছেন।

ব্রজকিশোর চোখ বুজে বললেন—হুঁ।

ওঁদের গুরুদেবও সঙ্গে আছেন নাকি। বলেছেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। কুসুমপুরে চলোই না সব।...গাঙ্গুলিমশায়, কী ভাবছেন?

উঁ?

হুকুম পেলে পাত্রের ব্যবস্থা করি।

কে?

নিবারণ মুখুয্যের ছেলে।

ও তো গাঁজাখোর!

জোয়ান বয়েসে একটু আধটু...

থামো হে দাশু, ঘ্যানর ঘ্যানর করো না।...বলে ব্রজ গাঙ্গুলি হঠাৎ সোজা হলেন।—চাঁদু! ছোটোকাকুর মাকে ডেকে দে তো বাবা। হ্যাঁ কোথায় আসছে বললে? মোহনপুরে?

দাশুবাবু অবাক হয়ে বললেন, আজ্ঞে, হ্যাঁ।

খবর পেয়ে মন্দাকিনী এলেন। ব্রজকিশোর বললেন, দাশু ভায়া! একটু গা তোলো। আমি কথা বলব।—

রাত দশটা প্রায়। গাঙ্গুলিবাড়িতে সানাই বাজছে। অসহ্য। অথচ গরমে জানালা বন্ধ করার উপায় নেই। ক্ষমা ও দীননাথ শুয়ে পড়েছেন। বাড়ি স্তব্ধ। অন্ধকারে বিষণ্ণতা গুমগুম করে বাজছে যেন। হঠাৎ গোকুলবাবুর আওয়াজ পাওয়া গেল, বাবুমশাই! বাবুমশাই! শিগগির আসুন! ওগো, সব ওঠ তোমরা! হারাধন, রাঘব! বিপিন! গোবর্ধন!

ব্যাপার কী? আবার মুরগীচোর নাকি? দীননাথ অভ্যাসবশে বন্দুক নিয়ে দরজা খুলে বারান্দায় গেলেন।

রেলিঙে ঝুঁকতেই সারা বাড়ির সাজানো আলো জ্বলে উঠল। দেখলেন নীচের প্রাঙ্গণে যেখানে ছাদনাতলা হয়েছিল, উত্তরা ও অরুণকে সেখানে বসানো হচ্ছে। দীননাথ প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে থেমে পড়লেন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন।

ক্ষমা এসে বললেন, কিসের চেঁচামেচি? হল কী রাতদুপুরে?

তারপর ব্যাপারটা দেখতে পেলেন। কিন্তু দীননাথের যেটুকু চোখ এড়িয়েছিল, তাঁর এড়ালো না—কারণ, মনে তিনি ভক্তিমতী। ছাদনাতলায় সৌম্য শান্ত উজ্জ্বল শরীরে দাঁড়িয়ে আছেন গুরুদেব। অমনি দীননাথের হাত ধরে তিনি হিড়হিড় করে টেনে সিঁড়িতে গেলেন। আর তার একটু পরে কুসুমপুরের এই দক্ষিণপাড়াতেও মিঠে সুরে সানাই বাজতে থাকল।

স্বর্গের আড়ালে

সেই কতবছর আগে একবার এসেছিল বিশুদা। এই দ্বিতীয়বার এলো। কিন্তু দেখামাত্র চিনতে ভুল হয়নি। যদিও খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সেবার এসেছিল সাইকেলে চেপে। এবার এলো জিপগাড়ি হাঁকিয়ে। পরনে আর ধুতি-পাঞ্জাবি নয়, সিন্থেটিক কাপড়ের সাফারি স্যুট। দাঁতে কামড়ানো পাইপ। চেহারা ঝলমল করছে। মেদ জমেছে গায়ে গতরে। টাকাকড়ি মানুষকে কীভাবে যে আমূল বদলে দেয় দেহ-মনে!

আমাদের পুরোনো একতলা বাড়ির ভাঙাচোরা পড়ো-পড়ো, গেট পেরিয়ে আমাকে দেখেই বলল, কাটু না? ইশ! কী পেল্লায় জোয়ান হয়েছিস রে তুই!

সেবার প্রণাম করেছিলাম কী না ভুলে গেছি। কিন্তু এবার ওই জিপগাড়ি, সাফারি স্যুট, ঝলমলে চেহারা আমাকে শিরদাঁড়া নুইয়ে দিল। কিন্তু জুতোর ডগা ছুঁতে না ছুঁতে বিশুদা আমাকে দুহাতে সোজা করে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, আদিখ্যেতা করিস নে। মাসিমা কই? মাসিমা, ও মাসিমা!

বিশুদা ভেতরে ঢুকে গেল। তার আগেই অবশ্য জানালা দিয়ে নুড়িদি মানে আমার দিদি ওকে দেখতে পেয়েছিল। দিদির এই এক অভ্যাস যখন-তখন জানালার ধারে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন কেউ আসবে। তার হইচই শুনে শুনে টের পেলাম, বাঘিনী যেমন করে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেই রকম একটা কিছু ঘটছে। তার চ্যাঁচানি কানে এলো, মা! ওফ্! এই দ্যাখো কে কে এসেছে।

আমি কেন যেন গেটের ধারে জিপগাড়িটা দেখতে গেলাম। নতুন ছাইরঙা গাড়িটার বাস্তবতা পরীক্ষা করছিলাম হয়তো। ড্রাইভিং সিটে একটা সুন্দর তোয়ালে, ডানদিকের সিটে একটা বিফ্রকেস। জিপটার গায়ে প্রচুর জলকাদার ছোপ। বাড়ির সামনে এই পিচরাস্তাটা তিন-চারমাসের বৃষ্টির ধাক্কায় এবড়ো-খেবড়ো হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া কাল মাঝরাতে কিছুক্ষণ বৃষ্টিও পড়েছিল। খানাখন্দে জল জমে আছে। এই সকালে কিন্তু দারুণ ঝকমকে শারদীয় রোদ্দুর। হাফ-পাড়া-গাঁ হাফ-টাউন এই পুরোনো জনপদে ওতপ্রোত

ঠাসা বৃক্ষলতা আর ঘাস। আমার তো ভালোই লাগে। যদিও নুড়িদির মতে, 'এটা একটা জগাখিচুড়ি বোগাস্ হচপচ ব্যাপার।' নুড়িদির কথার ছাঁদটাই এরকম অবশ্য।

বিশুদা থাকে মাইল দশেক দূরে ভাগীরথী তীরে ছোটখাটো একটা টাউনে। ইংরেজ আমলে যেটাকে গঞ্জ বলা হত এবং জেলার ইতিহাসে লেখা আছে, আর্মানি বণিকরা সেখানে রেশমের ব্যবস্থা করত।

কিন্তু বিশুদা সত্যিই একটা জিপ কিনেছে, এটা কেন যেন বিশ্বাস করতেই বাধছিল। জিপটার গায়ে হাত রেখে আনমনা হয়ে পড়েছিলাম খালি। সেইসময় নুড়িদি দৌড়ে এলো এবং আমাকে গ্রাহ্য না করে বিশুদার ব্রিফকেসটা তুলে নিয়ে চলে গেল।

রাস্তা দিয়ে সাইকেলরিকশো, একটা ইটবোঝাই ট্রাক, কিছু পায়ে চলা মানুষজন চলে গেল। তারা জিপটাকে আড়চোখে দেখতে দেখতে গেল। এইতেই একটা প্রচ্ছন্ন গর্বে মনটা ফুলে উঠল আমার। সেই গর্ব আরও চাগিয়ে দিতে নুটু চক্কোত্তি মশাই আসতে আসতে থমকে দাঁড়ালেন। কিছুকাল আগে চোখের ছানি অপারেশন করিয়েছেন। এখনও চশমার একটা চোখে কালো ঠুলি। বললেন, কে ওটা?

আমি কাটু জ্যাঠামশাই!

ওটা কী?

জিপগাড়ি, জ্যাঠামশাই! ঝটপট বলতে থাকলাম। কল্যাণগঞ্জের বিশুদার—মানে আমাদের রিলেটিভ আর কী! আপনি হয়তো চিনবেন—

নুটুবাবু হাসলেন। চিনি রে বাবা, চিনি। কল্যাণগঞ্জের—মানে বিশ্বনাথ চৌধুরী তো? কমল চৌধুরীর ছেলে! ওর বাবার সঙ্গে পড়াশুনো করেছি। বিশুকে চিনব না? এখন তো শুনি, সে মস্ত লোক। লিডার হয়েছে। বিজনেস করে পয়সা করেছে। ওর সব খবর রাখি।

নটুবাবুর হাতে লাঠি। একপা একপা করে সাবধানে জিপগাড়িটার কাছে এলেন। একটু হেসে রহস্যময় ভঙ্গী করে চাপা স্বরে বললেন ফের, মেঘ না চাইতেই জল। হাতের কাছে পেয়ে গেলাম বিশুকে। কাটু, আমাকে একটু হেল্প করো। তোমাদের বারান্দায় গিয়ে বসি। ওকে একটু খবর দাও, বাবা।

একটু বিব্রত বোধ করছিলাম। এইমাত্র এসেছেন বিশুদা। রেগে যাবেন কিনা কে জানে। কিন্তু এখানকার একদা পরাক্রমশালী এবং বর্তমানে ফতুর এক ভদ্রলোক, অথচ আমাকে যিনি ভুলেও পাত্তা দেন না—এমন করে বলছেন এবং তার চেয়ে বড় কথা, যিনি আমাদের বাড়ি জীবনে একবারও আসেননি, তিনিই

আমার সাহায্য নিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসতে চাইছেন, আমার মনে হল এটা আমার ফ্যামিলির একটা চমকপ্রদ জয়ের ঘটনা।

তাঁকে বারান্দায় একটা চেয়ার এনে বসতে দিয়ে ভেতরে গেলাম। দেখলাম, ভেতরের বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন বিশুদা। নুড়িদি তার সামনে জীর্ণ থামে হেলান দিয়ে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে ওঁর দিকে। বিশুদা মায়ের সঙ্গে কীসব কথা বলছেন! না মাসিমা, আজ নয়। অন্যদিন হবে। কথা দিচ্ছি, পুরো একটা দিন কাটিয়ে যাবো।

মা কান্না চেপে বললেন, তোমরা তো সব ভুলেই গেছ আমাদের। কী ভাগ্যে যদি বা এলে, এসেই—

মা কান্না সামলাতে ঢোক গিললেন। বিশুদা হা হা করে হেসে বলল, কী যে বলেন মাসিমা! ভুলেই যদি যাবো—এলাম কেন?

নুড়িদি বাঁকা ঠোঁটে বলল, একে আসা বলে না। অন্য কাজে এসে হঠাৎ দয়া করে একবার উঁকি মারতে আসা।

বিশুদা হাসির মধ্যে আমার দিকে ঘুরে বললেন, কী রে কাটু? তোর খবর বল্। তুই তো অন্তত একবার যেতে পারিস।

মা মাননীয় অতিথির সেবায় ব্যস্তভাবে কিচেনের দিকে চলে গেলেন। নুড়িদি আমার হয়ে বলল, গেলে ভারি দর্শন পাবে! তুমি তো ডুমুরের ফুল! এমন কী, বিয়ের নেমন্তন্নটুকুও পাইনি আমরা। না হয় যেতাম না। শুনেও খুশি হতাম যে বিশুদা—নুড়িদি হঠাৎ থেমে চোখে ঝিলিক তুলল!...বউদি নিশ্চয় কলকাতার মেয়ে?

বিশুদা হাসি থামিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। কপট গাম্ভীর্যে বলল, কী সব বলছিস? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে নুড়ি? এর জন্যই তোর নাম নুড়ি।

বলেই আবার ফিকফিক করে হাসতে লাগল। নুড়িও অভিমানী গাম্ভীর্যে বলল, হুঁ—সব বুঝি বাবা!

তুই কিছু বুঝিসনে! আমি বিয়েই করিনি!

থামো, চালাকি!

তুই বিশ্বাস কর, বিয়ে করিনি এখনও। বিশুদা পাইপের ছাই ঝাড়তে বারান্দার ধারে গেল। তারপর চেয়ারে ফিরে এসে বলল, আমার মরবার ফুরসত নেই তো বিয়ে! হাজারটা কাজে সবসময় অস্থির। ওসব কথা ভাববার সময় কোথায় রে পাগলি?

নুড়িদি এবার হাসলো। হুঁ—শুনেছি তুমি তো পার্টি করে বেড়াও। লিডার বলে কথা!

বিশুদা আমার দিকে ঘুরল।...কী রে? তুই যে বোবা হয়ে গেলি। কী করছিস-টরছিস বললি না তো?

মা এলেন ব্যস্তভাবে। আড়চোখে দেখছিলাম, কচির মাকে কোথায় যেন পাঠাচ্ছেন। ষড়যন্ত্রসংকুল ভঙ্গী। নিশ্চয় বাজারে পাঠালেন সন্দেশ-টন্দেশ আনতে। এসে বিষাদমাখা গলায় বললেন, কাটু বেকার বসে আছে বাবা। বি. এ পাশ করে হাজারটে জায়গায় অ্যাপ্লিকেশন করে চলেছে। দু-চারটে ইন্টারভিউও দিলো। কিন্তু কোথায় কী? এদিকে সংসারের অবস্থা আজকালকার বাজারে তো বুঝতেই পারছ।

বিশুদা সত্যিকার গাম্ভীর্যে বললেন, হুঁ। তা অ্যাদ্দিন আমার কাছে যাসনি কেন রে হাঁদা ছেলে? কত এলেবেলে ছেলের ব্যবস্থা করে দিলাম, আর তুই...কোনো মানে হয়?

বলতে যাচ্ছিলাম, তুমি চাকরি দিতে পারো জানতাম না। কিন্তু বললাম না। নুড়িদি আমার দিকে চোখ কটমটিয়ে বলল, নে। এবার শুনলি তো? বিশুদা তুমিও কিন্তু নিজের মুখে প্রমিস করলে।

বিশুদা আমাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে বললেন, এ উইকটা আমি ভীষণ ব্যস্ত। আমার দেখা পাবিনে। তুই আগামী সপ্তাহে শুক্রবার আয়। বাড়িতেই থাকব।

আস্তে বললাম, নুটু জ্যাঠামশাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। বাইরে ওয়েট করছেন।

বিশুদা ভুরু কুঁচকে বললেন, কে?

মা সঙ্গে সঙ্গে রেগে গিয়ে চাপা গলায় বললেন, ঢঙ! বিষ নেই কুলোপানা চক্কর! গিয়ে বলে দে, বিশু এখন ব্যস্ত। নাপিত দেখলে নোখ বাড়ে—তাই না?...বলে বিশুদার দিকে ঘুরলেন। গলার স্বর শ্বাসপ্রশ্বাসে মিলিয়ে গেল এবার।...ওই নুটুবাবু আমাদের কী সর্বনাশ করেছে জানো? যতবার যত জায়গায় নুড়ির জন্য সম্পর্ক করতে গেছি, ভাংচি দিয়ে বেনামী চিঠি লিখেছে। এলাকা জুড়ে মিথ্যে করে একশো কেলেংকারি রটিয়েছে নুড়ির নামে। যেখানে যাবে, সেখানে খালি আমার মেয়ের নামে একশো কেচ্ছা।

বিশুদা নুড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। নুড়ি চোখ নামিয়ে দ্রুত ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিশুদা একটু হাসল। মাসিমা, ও নিয়ে ভাববেন না। তা হলে আমার হঠাৎ এসে পড়ার কথাটা এবার বলি। তিন মাইল দূরে সোনাতলার রাস্তায় একটা কালভার্টের কাজ হচ্ছে। কন্ট্রাক্টারিও একটু-আধটু করছি ইদানীং। তো রথ দেখা কলাবেচা দুই-ই সারতে এলাম। আসলে আমি নুড়ির জন্য একটা সম্বন্ধ

এনেছি। পাত্র আমার খুব জানাশোনা। স্বাস্থ্য, চরিত্র, শিক্ষাদীক্ষা সবেতেই যোগ্য। স্কুলের টিচার। শুধু একটাই ইয়ে—মানে, স্ত্রী অসুস্থ হয়ে মারা গেছে। একটা বছর আড়াই-এর খোকা আছে। পাত্রের মা বৃদ্ধা। সংসারে আর কেউ নেই। নুড়িই কর্ত্রী হবে—বুঝলেন তো? শুধু একটাই দায়—ওই বাচ্চাটা!

মা সব শুনছিলেন। আস্তে শুধু বললেন, বয়স?

তা অ্যাবাউট ছত্রিশ-আটত্রিশ হবে। এম. এ পাশ।

কল্যাণগঞ্জে বাড়ি?

হ্যাঁ। নিজেদের বাড়ি।...বিশুদা পাইপ খুঁচিয়ে সাফ করতে করতে বললেন, অন্য আর সব ঠিক আছে। মানে—স্বজাতিই। অসবর্ণ সম্বন্ধ নিয়ে আসিনি।

বিশুদা হাসতে লাগলেন। মায়ের মুখে ব্যাকুলতা ফুটে উঠতে দেখছিলাম ক্রমশ। একটা আবেগ তাঁকে অস্থির করছিল। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, সব ভার তোমার ওপর দিলাম, বাবা! তুমি যা ভালো বোঝো, করবে। আমার তাতে অমত নেই।

বলে আবার দৌড়োলেন কিচেনের দিকে। কচির মা ফিরে এসেছে।

বিশুদা ডাকলেন, কী রে নুড়ি? গা-ঢাকা দিলি কেন? কাম হিয়ার!

নুড়িদির সাড়া এলো না।

বিশুদা চোখ নাচিয়ে বললো, লজ্জা পেয়েছে। মেয়েদের এই একটা অদ্ভুত স্বভাব, বুঝলে কাটু? হাব-ভাব চালচলনে বাঘিনী, কিন্তু বিয়ের কথা উঠলেই নেতিয়ে যায়।

হুঁ, বিশুদা হয়তো ঠিকই বলল। নুড়িদি আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড়। সবতাতেই—যাকে বলে, 'মিলিট্যান্ট', আমার বন্ধু সুতপনের ভাষায়। আর কদাচিৎ মায়ের ভাষায় 'জংলি'। মাঝে মাঝে মেয়ের জন্য গর্ব করে বলেন, নুড়ি যদি ছেলে হত, আর কাটু যদি মেয়ে, সংসারের চেহারাটাই বদলে যেত। গায়ের জোরে মল্লিকরা খিড়কির পুকুরের দখল নিতে এসেছিল—তখন নুড়ি না থাকলে যে কী হত? কে করত থানা-পুলিশ, কে যেত জে. এল. আর. ও আপিসে ছুটোছুটি করতে? কাটু তো মুখ তুলে কথা বলতেই পারে না।

আমার সম্পর্কে মায়ের এ অনুযোগ পুরোপুরি ঠিক নয়। আসলে ওটা পুকুর নয়। মোটামুটি একটা বড় ডোবা মাত্র। আর সমাজে এই একটা ব্যাপার আশ্চর্য লাগে, পুরুষরা মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে কেন যেন [illegible] পায়। এখন কথা হল, মল্লিকদের সামনে নুড়িদি গিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। [illegible] লেই ওরা ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে সাহস পায়নি। কিন্তু আমাকে সামনে পেলে আলবাৎ ধাক্কা মারত। চড় থাপ্পড়ও মেরে বসত হয়তো।

তা হলেও নুড়িদির সাহস আমি স্বীকার করি। সে আমার চেয়ে ক্ষিপ্র, তেজী, মুখর। তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও আমার চেয়ে বেশি। সে দারুণ স্মার্টও বটে আমার তুলনায়।

কিন্তু এই যে নুড়িদি বিশুদার কথা শুনেই ঘরে গিয়ে ঢুকল, ওটা তার লজ্জায় নেতিয়ে পড়া নয় বা বিয়ের কথা শুনে রাঙামুখে আত্মগোপনও নয়। আমি জানি—সব জানি। তবু বিশুদাকে তো দূরের কথা, মাকেও আমার বলার সাহস নেই। তাছাড়া এটা নুড়িদির ব্যাপারে নাক গলানো হয়ে উঠবে। কী দরকার ঝুট-ঝামেলায়?

বিশুদা কিন্তু খাবে না। অথচ মা তাকে না গিলিয়ে ছাড়বেন না। নাড়ুর দোকানের ওই ছাইপাঁশ সন্দেশ কেনই বা খেয়ে পেট খারাপ করবে বিশুদা—কত ভালো ভালো খাবার সে খায়। সন্দেশের একটা কুচি ভেঙে শেষপর্যন্ত 'মাসিমার' মুখ রাখল। তবে চা-টা তারিয়ে তারিয়ে খেল। পাইপে আবার তামাক ভরল। কিন্তু তামাকের জন্য ব্রিফকেস খোলার সময় চোখের কোনা দিয়ে আমি দেখলাম ওটার ভেতর কয়েকটা একশোটাকার নোটের বান্ডিল। অত্তো টাকা! বিশুদার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম। আমার মনে পড়ে গেল সেই সাইকেল চেপে আসা দিনটির কথা। পরনে যেমন-তেমন ধুতি-পাঞ্জাবি, রোগা, ক্লান্ত এক তরুণ। বাবার কাছে কী একটা জরুরি কাজে—জানি না, জানবার দরকারও হয়নি কোনোদিন। আজ এ মুহূর্তে মনে হল, সেটা জেনে নেওয়া খুবই দরকার।

কবে কল্যাণগঞ্জের সেই বিপত্নীক স্কুলশিক্ষক নুড়িদিকে দেখতে আসবেন, তার খবর আগাম পাঠাবে বিশুদা এবং দেখতে আসার দিন মায়ের বিশেষ অনুরোধ, 'বিশু, তুমি না এলে কিছুই হবে না,' বিশুদা সুতরাং সঙ্গে আসবে—এইসব কথাবার্তা ঝটপট সেরে নিয়ে বিশুদা বেরোলো।

বাইরের বারান্দায় দেখি, তখনও নুটুবাবু লাঠিটা ধরে বসে আছেন—সদ্য ছানিকাটানো একটা চোখে কালো ঠুলি। বিশুদা ওঁকে দেখেও না দেখার ভঙ্গীতে চলে যাচ্ছে দেখে খারাপ লাগল। নুটুবাবুও ব্যস্তভাবে 'বিশু, ও বিশু' বলে ডাকতে ডাকতে থপথপিয়ে নেমে গেলেন।

বিশুদা বিরক্ত মুখে বলল, বলুন নটুবাবু।

নুটুবাবু বিশুদার একটা হাত ধরে টানলেন। বুঝলাম, আমার সামনে আর্জিটা তুলতে চান না। তাই আমি একটু সরে বকুল গাছটার তলায় গেলাম। দেখলাম, নুটুবাবু চাপা স্বরে হাত-মুখ নেড়ে কী সব বলছেন আর বিশুদা যেন ইচ্ছে

করেই হাতের কবজি তুলে ঘড়ি দেখছে। মাত্র একমিনিট পরে বিশুদা এসে জিপে উঠল এবং আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে স্টার্ট দিয়ে জোরে বেরিয়ে গেল। রাস্তার গর্ত থেকে ছলাৎ করে খানিকটা ঘোলা জল ছিটকে নুটুবাবুর পায়ের কাছে ধুতি নোংরা করল। নুটুবাবু পাথরের মূর্তির মতো আরও এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর লাঠি টুকটুক করে হাঁটতে থাকলেন।

তারপর আমাদের বাড়ির পড়ো-পড়ো গেটে মাকে উজ্জ্বল মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাঁর পাশে তেমনি হাসিমুখে বাড়ির কাজের মেয়ে কচির মাও দাঁড়িয়ে আছে। ধাবমান জিপ গাড়িটিকে দেখছে।

ওরা ভেতরে গেলে গেটে ফিরে এলাম। ভেবেছিলাম বাইরের ঘরের জানালায় নুড়িদিকে দেখতে পাবো। কিন্তু জানালায় কেউ নেই।

মায়ের এবেলা অন্যরূপ। বিশুদা তাঁকে বদলে দিয়ে গেছে। কচির মায়ের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বলছেন। উজ্জ্বলতা ঝলমল করছে এখনও তাঁর মুখে। যেন আর এ পৃথিবীকে, নুটুবাবুকে বা এই মনসাতলার মানুষজনকে একটুও পরোয়া করেন না।

নুড়িদিকে খুঁজছিলাম। যে-ঘরে সে ঢুকেছিল, সে-ঘরে সে নেই। ওটা উত্তর-পূর্ব কোণের ঘর। পুবের জানালা খোলা। দেখলাম, নুড়িদি সবুজ জলে ভরা ডোবাটার পাড়ে ঝাঁকড়া পেয়ারা গাছটার তলায় পা ছড়িয়ে বসে আছে। ডোবার মাঝখানে একঝাঁক লাল ও শাদা শালুক ফুল ফুটে আছে। ফুলগুলোকে তাক করে ঢিল ছুড়ছে। আমি জানি, ওই ফুলগুলোর জন্য নুড়িদির প্রচণ্ড গর্ব আর ভালোবাসা আছে। অথচ তাদের দিকে সে ঢিল কুড়িয়ে খেলার ভঙ্গীতে ছুড়ছে। ব্যাপারটা ভালো লাগল না।

খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঘাটের কাছে কলাঝোপে একবার থমকে দাঁড়ালাম। হুঁ আমি ওকে ভয় করি। চেহারায় এখন যেন একটা চাপা হিংসার আদল। স্ফূরিত নাসারন্ধ্র। নিষ্পলক চোখ। খোঁপাভাঙা চুল।

খুব সাবধানে এগিয়ে গেলাম। বললাম, ইশ! এবার কত্তো পেয়ারা এসেছে রে গাছে—বলিসনি তো?

নুড়িদি তাকালো না। তখন আস্তে ডাকলাম, নুড়ি!

তখন সে একটু হাসল।...জ্বালাতে এলি?

পাশে বসে পড়লাম ঘাসের ওপর। বললাম, এলাম।

নুড়িদির হাসির চোটে আমার কথা থেমে গেল।

হাসছিস কেন রে?

নিজের বোকামির জন্যে। নুড়িদি খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে বলল। একটা লোক

দিব্যি এসে ডাঁট দেখিয়ে গেল। আর আমি তাকে কী খাতির না করে ফেললাম। মা পর্যন্ত! আমরা কী বোকা, তাই না কাটু?

ঠিক বলেছিস রে! মায়ের সামনে বিশুদা পাইপ টানছিল দেখলি? কী অভদ্র!

অথচ এই বিশুদা সেবার বাবার কাছে টাকা ধার চাইতে এসেছিল, জানিস?

খুব অবাক হয়ে গেলাম শুনে। সে টাকা বিশুদা শোধ দিয়েছিল কি জানি না, কিন্তু তার ব্রিফকেসে রাখা নোটের বান্ডিল আমার কাছে এতক্ষণে তুচ্ছ বস্তু হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বললাম, বিশুদা আমাদের কে হয় রে?

নুড়িদি মুখ বাঁকা করে বলল, কে হবে আবার? কেউ না। জাস্ট পাতানো সম্পর্ক।

দিদি-ভাই মিলে সেই আশ্বিনের সকালে আমরা এক আশ্চর্য সহকারে আবিষ্ট হয়ে রইলাম।

বিশুদা এসে সত্যি আমাদের বাড়ির লোকজনকে দারুণ বদলে দিয়ে গিয়েছিল। সবসময় তেতো আর সবতাতেই খুঁতধরা আমার মায়ের মুখে হাসি ফুটেছিল। দোষীদের ক্ষমা করতে যথেষ্ট উদার ও প্রস্তুত তিনি—যেন জজ হলে ফাঁসির যোগ্য আসামীকেও খালাস করে দিতেন।

নুড়িদির বদলটা অন্যরকম। হাসিখুশি, চঞ্চল, বেপরোয়া মেয়ে ছিল সে। এবার দেখি, সে গম্ভীর, চুপচাপ, আনমনা আর কেমন যেন ভীরুতার পিছুটানে সাবধানে পা ফেলছে।

আর আমি? আমি জানি না, কেন এত উদ্বিগ্ন! খালি মনে হচ্ছে, কী একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে। অথচ বিশুদা আমার চাকরির ব্যবস্থা করবেন বলে গেছেন। সামনে শুক্রবার আমার কল্যাণগঞ্জে ওঁর কাছে যাওয়ার কথা। একটা চাকরি পেলেই তো আমার বরাত খুলে যাবে। কিন্তু তবু কেন যেন মনে হচ্ছে, এমন একটা সন্ধিকালের মুখোমুখি হয়েছি, যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ভারি কঠিন। যেন আমার চাকরির সঙ্গে নুড়িদির জীবনেরও কোনো গূঢ় সম্পর্ক থেকে গেছে। মাঝেমাঝে চমকে উঠে ভাবছিলাম, সেই বিপত্নীক শিক্ষকের সঙ্গে নুড়িদির বিয়ের প্রস্তাব আমার চাকরির জন্য একটা শর্ত নয় তো?

না—বিপত্নীক দোজবর বা বয়স্ক লোক বলে নয়, আড়াই বছরের একটা শিশুকে চিতাবাঘের বাচ্চার মতো নুড়িদির জীবনের সবুজ ভূমিতে খেলা করতে দেখেছিলাম। সেটাই যত ভয় আমার। মেয়েরা নাকি মায়ের প্রজাতি, মা হওয়াটাই তাদের জীবনের নাকি একান্ত উদ্দেশ্য, আর মা হতে নাকি তারা ভালোইবাসে। কিন্তু নুড়িদি! ওর মধ্যে মায়ের আদল কি আছে? আমি জানি,

ও একজনের প্রেমিকা। ও জানে, তার সঙ্গে বিয়ে হবার সম্ভাবনা নেই—তবু কেন যে প্রেমিকা থেকে যেতে চায়? নুড়িদিটা সত্যি বড় অদ্ভুত মেয়ে।

রোজ বিকেলে এক চক্কর খেলার মাঠের দিকটায় ঘুরে আসি। খেলাধুলোর নেশা আমার নেই। তবু খেলা দেখতে মন্দ লাগে না। একদিন ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল মাঠটাতে। একটুখানি দাঁড়িয়ে ঝিলের দিকে চলে গেলাম। কতকালের পুরোনো এই ঝিল। কোন যুগে ভাগীরথী মনসাতলার বুক ঘেঁষে বয়ে যেত। এখন সরে গেছে তিনমাইল দূরে। ঝিলটা সেই পুরোনো খাতের চিহ্ন। এই শরতে ধনুকবাঁকা ঝিলের বুকভরা জল। জলজ উদ্ভিদে জঙ্গল হয়ে আছে। পানিফল, পদ্ম-শালুক, শোলাগাছ কতকিছু। ঝিলটার ওপারে ভরাট জমিতে কোথাও ধানক্ষেত, কোথাও ফুলবতী কাশবন, আর উঁচু অংশটাতে ভেঙে পড়া পুরোনোকালের এক শিবমন্দির। মন্দির ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে বিশাল বটগাছ, তার অজস্র ঝুরি।

ঝলমলে বিকেলের সূর্য পশ্চিম থেকে একঝাঁক রোদ্দুর পাঠিয়ে দিয়েছে ঝিলের ওপারের বটগাছটার দিকে। প্রথমে ভাবলাম চোখের ভুল। কিন্তু ভুল নয়। নুড়িদি আর বারীনদা একটা ইটের প্রকাণ্ড চাবড়ায় বসে আছে পাশাপাশি।

এই ঝিলটা সমবায় মৎস্যজীবী সমিতিকে সরকার ইজারা দিয়েছেন। বারীনদা মৎস্যজীবী নয়, কিন্তু সমিতির সভাপতি। এ পাড়টা উঁচু। ঢালু হয়ে নেমে গেছে ঘাসে ঢাকা মাটি। ঝিলের জলে তলিয়ে গেছে। একটু তফাতে ভারু জেলেকে দেখলাম ছোট্ট নৌকোয় বসে সিগারেট টানছে।

লজ্জা কিংবা ক্ষোভ, নাকি ঘৃণা আমাকে আকন্দঝোপের আড়ালে নিয়ে গেল। কিন্তু তিষ্ঠোতে পারলাম না। পিছু ফিরে চলে এলাম। খেলার মাঠের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পিচরাস্তায় পৌঁছোলাম। এবার বাঁদিকে হাঁটলে বাড়ি, ডানদিকে হাঁটলে বাজার। বাড়ি গিয়ে মাকে কি সব কথা খুলে বলব—এতদিন ধরে যা কিছু দেখেছি এবং এখন যা দেখলাম?

তারপর মনে হল, কী দরকার ঝামেলা বাড়িয়ে? মায়ের হাসিখুশি ভাবটাকে তছনছ করে দিতে ইচ্ছে করল না। পৃথিবীতে মানুষ নিজের-নিজের জীবনকে নিয়ে যা খুশি করতেই পারে। আমি নাক গলাবার কে?

সেদিন নুড়িদি ফিরল একটু সন্ধ্যা গড়িয়েই। মায়ের কাছে কী একটা কৈফিয়ত দিয়ে থাকবে, আমি জানি না। অভ্যাসমতো আমার ঘরে আড্ডা দিতেও এলো না। একটু তফাত থেকে ওকে লক্ষ করছিলাম। কিন্তু কোনো পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হল না। তেমনি চটপটে স্মার্ট দেখছিলাম ওকে।

পরদিন সকালে হঠাৎ কী একটা খেয়াল আমাকে পেয়ে বসল। বাসে চেপে কল্যাণগঞ্জ চলে গেলাম। কল্যাণগঞ্জে আমার কলেজ জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু বলতে অশনি, যার ডাকনাম হাবুল। তার হাবুল নামটা আমি জানতাম। কিন্তু আমার কাটু এই ডাকনামটা সে কেন, আর কেউই জানত না।

গঞ্জে হাবুলরা বড় ব্যবসায়ী পরিবার। আড়ত, কোল্ডস্টোরেজ, পেট্রলপাম্প কতকিছুর মালিক। কাজেই হাবুলকে চাকরি খুঁজতে হয়নি। মাঝে সাঝে এখানে এলে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সেই সূত্রে জানতাম, হাবুল পেট্রোলপাম্প দেখাশোনা করে। বাজার ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে হাইওয়ের মোড়ে সেই পাম্প।

হাবুল একদঙ্গল লরির একপাশে দাঁড়িয়ে খুব হাত-মুখ নেড়ে কার সঙ্গে কথা বলছিল। আমাকে দেখে এগিয়ে এলো মুখভরা হাসি নিয়ে।...কাজল! আয়, আয়। কালই বিশুদা তোর কথা বলছিল।

একটু অস্বস্তি ছুঁল আমাকে। বললাম, কী বলছিল রে?

হাবুল প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়া গাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে বলল, বলছিল তোদের বাড়ি গিয়েছিল।

আর কিছু না?

হাবুল একটু অবাক হল প্রথমে। তারপর চোখ নাচিয়ে বলল, কেন? স্পেশ্যালি বলার মতো কিছু করেছিস নাকি?

আস্তে বললাম, একটা ব্যাপার হাবুল। প্লিজ, বিশুদা যেন জানতে না পারে।

হাবুল রহস্যের গন্ধ পেয়ে যেন খুশি হল। বরাবর ওর এই অভ্যাস। কার পেছনে কী স্ক্যান্ডাল বা গোপন ব্যাপার, সবটাই জানা চাই তার। চাপাস্বরে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠল, কী, কী?

সেই স্কুল টিচারের কথাটা বললাম ওকে। নুড়িদিকে হাবুল কখনও দেখেনি এবং তার কোনো কথাই সে জানে না। কাজেই ঝটপট বলে দিল, ভেরি-ভেরি গুড প্রপোজাল। তপনবাবুর মতো জেন্টলম্যান হয় না রে! বলে একটু হাসল।...আমি অবশ্য কাকা বলে ডাকি ওঁকে। তোর জামাইবাবু হলে বরং রিলেশানটা উল্টে নেবো। সে আমি পারি।

হাবুল খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে সিগারেট দিল আমাকে। ওর লোকেরা দুটো ফোল্ডিং চেয়ার পেতে দিয়ে গেল। চা-ও আনতে গেল। তখন বললাম, হাবুল আমার সঙ্গে তপনবাবুর আলাপ করিয়ে দিবি?

হাবুল সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে বলল, আমি সার্টিফাই করছি—ভেরি গুড ম্যান। মাটির মানুষ না কী বলে যেন, ঠিক তাই। তবে আলাপ করতে দোষ কী? যা—সোজা একটা রিকশো করে চলে যা কালীতলার মোড়ে। ওখানে নেমে যাকে জিজ্ঞেস করবি, তপনকাকার বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

হাবুল, তুই সঙ্গে গেলে ভালো হয়।

হাবুল একটু গম্ভীর হয়ে বলল, আমার যা অবস্থা, তুই কল্পনা করতে পারবি না। পিতৃদেব এমন ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে মাইরি! একটুখানি বেরোনোর উপায় নেই। এই তো দেখছিস এখনই গাড়ির লাইন পড়ে গেছে। তা ছাড়া কাউকে যে বিশ্বাস করে একটু বেরোবো, উপায় নেই। সব ব্যাটা চোর। তোর কোনো অসুবিধা হবে না। সোজা চলে যা।

চা না খাইয়ে হাবুল ছাড়ল না। লোক পাঠিয়ে একটা সাইকেল রিকশো ডাকলো এবং ভাড়াও ঠিক করে দিল। ফেরার পথে দেখা করে যেতেও বলল।

তপনবাবুর বাড়ি খুঁজে বের করতে দেরি হল না। একেবারে গঙ্গার শিয়রে একতলা বাড়ি। আমাদের বাড়িটার মতোই পুরোনো, তবে এমন জরাজীর্ণ নয়। বাইরের ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার পর এক বৃদ্ধা দরজা খুলে অমায়িক স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কাকে চাই বাবা?

বললাম, তপনবাবুকে।

বৃদ্ধা সস্নেহে ডাক দিলেন, তা বাইরে কেন? ভেতরে এসে বসো। ডেকে দিচ্ছি খোকাকে।

খুব গলে গেলাম কণ্ঠস্বর আর আপ্যায়নে। ভেতরে ঢুকে দেখি, সাধারণ সোফাসেট, দুটো বুকসেলফ অন্যদিকে চেয়ার-টেবিল। দেওয়ালে মহাপুরুষদের বাঁধানো ছবি। আরও ভালো লেগে গেল।

বৃদ্ধা ভেতরে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একটা ছোট্ট ছেলে নড়বড় করে পা ফেলে দরজা আঁকড়ে এঘরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। টুকটুকে ফর্সা রং, লাল জাঙ্গিয়া আর গেঞ্জি পরা বাচ্চাটাকে কী ভালো যে লাগল! বৃদ্ধা কপট ধমক দিয়ে বললেন, ওরে দুষ্টু! ফের আছাড় খেয়ে রক্তারক্তি করবি খেয়াল আছে!

ওকে কোলে তুলতেই কান্নাকাটি জুড়ে দিল। হাত পা ছুড়তে শুরু করল। বৃদ্ধা আমার দিকে ঘুরে একটু হেসে বললেন, বড্ড দস্যি, বাবা!

বাচ্চাটাকে আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু বৃদ্ধা তাকে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। মিনিট খানেক পরে ভেতর থেকে কুচকুচে কালো ঢ্যাঙা, কাঁচাপাকা চুল, রোগা গড়নের এক লুঙ্গি-গেঞ্জিপরা ভদ্রলোক এলেন। এসেই একটু অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, বলুন ভাই!

উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললাম, আমি মনসাতলা থেকে আসছি। আমার নাম কাজল রায়। বিশুদার কাছে আপনার কথা শুনেছি। তো—

কথা কেড়ে তপনবাবু বললেন, কী আশ্চর্য! বসুন, বসুন।

তপনবাবু আমার পাশে এসে অন্তরঙ্গভাবে কাঁধে হাত রাখলেন এবং নিজেও বসলেন। আমি আরও অভিভূত হয়ে পড়লাম। কুণ্ঠাজড়িত স্বরে বললাম, এসেছিলাম বিশুদার কাছে একটা কাজে। শেষে ভাবলাম, আপনার সঙ্গে আলাপ করে যাই।

তপনবাবু হাসলেন। ভালোই তো! আগে-ভাগে আলাপ হওয়া দরকার বৈকি। কালই রাত্রে বিশুবাবু বলছিলেন, শুক্রবার আপনার আসার কথা। আমরা কবে যাচ্ছি, আপনাকে জানিয়ে দেবেন বলছিলেন।

বলে উনি উঠে গেলেন ভেতরে। বুঝলাম হবুকুটুম্বের যথাবিহিত আতিথ্যের বব্যস্থা করতেই গেলেন। এতক্ষণে মনে হল, আমি ভুল করে ফেলেছি। যে কঠিন কথাটা বলার জন্য ছুটে এসেছি, আর কি তা বলা যাবে?

নিচু টেবিল থেকে বাসি খবরের কাগজটা খুলে বসে রইলাম। তপনবাবু গেছেন তো গেছেন। ফিরছেন না। যখন দেখলাম, কাগজের খবর পড়তে পারছি না, শুধু মুদ্রিত অক্ষর দেখছি, তখন কর্মখালির বিজ্ঞাপনের পাতায় চোখ দিলাম। কিন্তু একটু পরেই আমার দুপায়ের ফাঁকে কিছু ঢুকছে টের পেয়ে চমকে উঠলাম। কাগজ নামিয়ে দেখি, সেই বাচ্চাটা সে আমার দুই পা আঁকড়ে সোজা হচ্ছে। মুখ ঝলমলে হাসি। ঝটপট কাগজ ভাঁজ করে রেখে তাকে কোলে তুলে নিলাম। সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে যেন চেনার চেষ্টা করছিল। আদর করে বললাম, আমি মামা! তোমার মামা! বলো, মামা।

বাচ্চাটা আমার থুতনি খামচে বলল, মা—মা!

হ্যাঁ, মামা।

মাম্মা! বাচ্চাটা খিলখিল করে হাসতে লাগল।

জানি না সব পুরুষই বাবার হৃদয় নিয়ে জন্মায় কি না। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। দেওয়ালের কাছে রবীন্দ্রনাথের ছবির দিকে আঙুল তুলে বললাম, বলো তো কে? বলো—কবি। হুঁ—বলো, ক—বি?

বাচ্চাটি বলল, কো—পি!

উঁহু! ক—বি।

সে রামকৃষ্ণ দেবের ছবিটার দিকে ছোট্ট আঙুল বাড়িয়ে আধো-আধো স্বরে বলল, নমো কই (করি)। টা—টা—কু! অর্থাৎ ঠাকুর। বুঝলাম, এটা তাকে শেখানো হয়েছে।

কতক্ষণ তার সঙ্গে খেলায় মেতে ছিলাম জানি না, হঠাৎ চোখে পড়ল, ভেতরের দরজায় বৃদ্ধা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, বড্ড দুষ্টু, বাবা। তবে যাকে দেখবে, তারই কোলে চাপবে।

বাচ্চাটা আমার কলার টানাটানি করছিল। বৃদ্ধা ধমক দিলেন, অ্যাই রন্টু! ও কী হচ্ছে?

বাচ্চাটার ডাকনাম তাহলে রন্টু! বললাম, রন্টু! বলো তো তোমার নাম কী?

বৃদ্ধা হাসতে লাগলেন। বলো, নাম বলো। মামাকে নাম বলো!

রুন্টু আমার চোখে চোখ রেখে বলল, মা—ম্মা!

এইসময় হাতে চায়ের কাপ আর প্লেট ভর্তি বিস্কুট ও সন্দেশ নিয়ে তপনবাবু ফিরলেন। বৃদ্ধার দিকে ঘুরে বললন, মা! জলের গ্লাসটা এনে দাও না।

তারপর নিচু টেবিলে চায়ের কাপ ও প্লেট রেখে রন্টুকে আমার কোল থেকে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু রন্টু আমাকে ছাড়বেই না। তপনবাবু বসে বললেন, ওকে নিয়ে এই প্রবলেম কাজলবাবু। মায়ের বয়স হয়েছে। হাঁপানির অসুখেও ভুগছেন। এদিকে কাজের লোক পাওয়া যায় না। একের পর এক আসে। চুরিটুরি করে কেটে পড়ে। ওদিকে আমার স্কুল, টিউশনি, হাজারটা ঝামেলা।

রন্টুকে উনি জোর করে ছিনিয়ে নিলেন। রন্টু কাঁদতে থাকল। বললাম, থাক না আমার কাছে।

বৃদ্ধা জল দিতে এসে রন্টুকে নিয়ে গেলেন। তপনবাবু বললেন, চা ঠান্ডা হয়ে যাবে। না—না সংকোচের কারণ নেই। কী ভাগ্যে এসে পড়েছেন। সবই ঠাকুরের ইচ্ছা! খান খান।

বুঝতে পারছিলাম, নিজেই চা করেছেন বা বিস্কুট সন্দেশ কিনে এনেছেন। সহানুভূতিতে গলে পড়লাম।

ওঁর খাতিরে অন্তত একটা বিস্কুট আর একটা সন্দেশ খেয়ে তৃপ্তির সঙ্গে জল খেলাম। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, আপনি চা খাবেন না দাদা!

তপনবাবু হাসিমুখে হাত নাড়লেন। হয়ে গেছে। আর না। আমি খুব সংযত জীবন যাপন করি। আসলে সবই ঠাকুরের ইচ্ছা ভাই। ছোটোবেলায় বাবা মারা গেছেন। তারপর অনেক স্ট্রাগল। জীবনে একটুখানি মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম। সইল না। রন্টুর মায়ের মৃত্যুর পর একরকম ঠিক করেই ফেলেছিলাম, সংসার ত্যাগ করব। কিন্তু ঠাকুরের ভিন্ন ইচ্ছা। মা আর ওই রন্টু—একটা কঠিন শেকল দুপায়ে বাঁধা। কী করি!

চা খাওয়ার পর আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন তপনবাবু। বাড়ির ভেতরটা ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন ঘরগুলো সাজানো-গোছানো। প্রত্যেকটি ঘর দেখিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে গঙ্গা দেখাতে নিয়ে গেলেন। আগাছার জঙ্গল আর গাছপালার নিচেই শরতের গঙ্গা। মুগ্ধ হলাম—কল্যাণগঞ্জে ছোটবেলা থেকে

যাতায়াত করছি, অথচ গঙ্গার এই সুন্দর রূপ কখনও লক্ষ্য করিনি। হয়তো কোনো সৌন্দর্য দেখার জন্য একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থাকে এবং এই বাড়ির খিড়কির দরজাটাই সেই দৃষ্টিকোণ।

তপনবাবু এবং তাঁর মা সে-বেলা খেয়ে যাওয়ার জন্য খুবই অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আমার মনে প্রচণ্ড ব্যস্ততা। তপনবাবুকে যা বলতে এসেছিলাম, তা তো বলা হলই না, বরং উল্টে নুড়িদিকে কিছু বলার তাগিদে আমি অস্থির।

যখন বাড়ি ঢুকছি, তখনও মনে মনে বলছি, নুড়িদি, তোর জন্য একটা স্বর্গ দেখে এলাম। কিন্তু নুড়িদিকে দেখতে পেলাম না বাড়িতে। সে কোথায় বেরিয়েছে। মাকে সামনে পেয়ে হুড়মুড় করে সেই স্বর্গ দেখার বিবরণ আওড়ে গেলাম। মা উজ্জ্বলমুখে কথাগুলো শুনছিলেন। শেষে শ্বাস ছেড়ে বললেন, ভালোই করেছিস বাবা। এবার নুড়ি আসুক। ওকে সব বল।

নুড়িদি ফিরল ঘণ্টাখানেক পরে। তখন আমি স্নান-খাওয়া সেরে ভাত-ঘুমের চেষ্টা করছি। ওর সাড়া পেয়েই ভাত-ঘুমের রেশটুকু ছিঁড়ে গেল। ডাকলাম, নুড়ি! শুনে যা!

নুড়িদি উঠোন থেকে বলল, কী!

আহা, আয় না বাবা! জরুরি কথা আছে।

আমি চান করব এখন।

করিস! আগে একবার আয় না!

নুড়িদি ঘরের দরজা থেকেই বলল, বল কী বলবি!

আঃ, ভেতরে আয় না! দারুণ খবর আছে তোর জন্য।

আমার ষড়যন্ত্রসংকুল কণ্ঠস্বরে কৌতূহলী হয়ে অগত্যা সে ভেতরে এলো। আস্তে বলল, কী রে!

আমি ওর সামনে আস্তে আস্তে আমার স্বর্গ-অভিযানের জট খুলতে থাকলাম। নুড়িদি কিন্তু আশ্চর্য নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে পুরোটাই শুনল। কোনো বাধা দিল না। সেদিনকার মতো ঘর থেকে হঠাৎ করে বেরিয়েও গেল না। রন্টুর কথাটা আমি খুব রং চড়িয়েই বলেছিলাম। তখন সে শুধু একটাই মন্তব্য করল, বাচ্চারা তো ওইরকমই।

আমার কথা শেষ হলে সে বলল, আর কিছু আছে?

হাসতে হাসতে বললাম, না। আপাতত এই।

নুড়িদি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাবার সময় তার মুখে কি কোনো রূপান্তর

দেখলাম? কে জানে! শুধু মনে হল, আমার কথা শোনার পর সে একটা সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে! তাই নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে বেরিয়ে গেল।...

এখন সবটাই স্বপ্নের মতো—আধা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়।

খুব শিগগির তপনবাবুর সঙ্গে দিদি—'নুড়িদি', অর্থাৎ তপতীর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য বিয়েটাতে জাঁকজমক এতটুকু ছিল না। নেহাৎ সাদামাটা ধরনের একটা বিয়ে। শুধু একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, যে অ্যামবাসাডার গাড়ি চেপে বর এসেছিল, সেটাও বিশুদার।

না—আরেকটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে। নুড়িদির দিক থেকে যে আশঙ্কাটা করেছিলাম, তা মিথ্যে। সে কোনোরকম আপত্তি প্রকাশ করেনি। বরং মনে হয়েছিল, আমার দেখে আসা স্বর্গের ভেতর ঢুকে যেতে পারলেই তার শান্তি।

স্বামীর সঙ্গে যখন অষ্টমঙ্গলায় সে এলো, তখনই রীতিমতো গিন্নি। রন্টুকে মায়ের মতো কোলে নিয়েই এসেছিল। এতে লোক হাসাহাসির ব্যাপার ঘটবে বলে সে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু নুড়িদিকে তো দেখে এসেছি ছোটোবেলা থেকে। পৃথিবীকে যেন ড্যামকেয়ার ভাব দেখিয়ে চলে। খিড়কির ডোবার পাড়ে পেয়ারাতলায় নুড়িদি আর রন্টুর হাসি, উঠোনে ওর হাত ধরে হাঁটি-হাঁটি পা-পা খেলা, হঠাৎ বুকে চেপে ধরে চটাস চটাস করে রন্টুর দুই গালে চুমু...এখনও স্পষ্ট দেখতে পাই। চমকে উঠি। বুকের ভেতর অতল শূন্যতায় ঠান্ডা হিম গড়িয়ে যায়।...

হেমন্তের শেষাশেষি বিশুদার করুণায় আমার চাকরিটিও হয়ে গেল।

কল্যাণগঞ্জেই বিশুদার 'অন্নপূর্ণা কন্সট্রাকশান কোম্পানি'র অফিস। অফিস মানে গঙ্গার ধারে ইটখেলার পাশে দরমাবাতার বেড়া, অ্যাজবেস্টসের চাল চাপানো ঘর। বড় ঘরটায় সিমেন্টের বস্তা আর হরেক জিনিসপত্রে ঠাসাঠাসি। ছোট ঘরটায় একটা লোহার আলমারি, একটা র‍্যাক, একটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার। বিশুদা বলেছিলেন, অফিসেই একটা খাটিয়া এনে দেবো। থাকতে পারিস।

দিনকতক সেখানেই ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন জামাইবাবু এসে জোর করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললেন। সেই বাইরের ঘরটায় থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর খালি কথায়-কথায় 'ঠাকুরের ইচ্ছা।' ঠাকুরের ইচ্ছায় আমাকে তিনি বাইরে থাকতে দেবেন না এবং পয়সা খরচ করে খেতে দেবেন না। বিশুদার এতে কোনো আপত্তি ছিল না। তাঁর কাজ নিয়ে কথা। তা ছাড়া

আমি অফিস ঘরটা রাতের আস্তানা করায় দারোয়ান এবং আরেকজন কর্মীকে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল।

ভোরবেলাই চা খেয়ে বেরিয়ে যাই অফিসে। দুপুরে ফিরে খাওয়া-দাওয়া করি। একটু বিশ্রাম নিই। তিনটে নাগাদ আবার অফিসে যাই। ফিরি রাত আটটা-ন'টায়। কোনো-কোনো রাতে আরও দেরি হয়ে যায়। ফিরে দেখি, জামাইবাবু আমার জন্য জেগে বসে আছেন। নুড়িদির সাড়া নেই। জামাইবাবুই আমাকে কিচেনে নিয়ে গিয়ে খাওয়ান। আমি বলি, খাবারটাকে ঢেকে রাখলেই তো হয় জামাইবাবু। কেন এত কষ্ট করেন?

জামাইবাবু কপালে জোড়া হাত তুলে খালি বলেন, ঠাকুরের ইচ্ছে ভাই, কাজল!

নুড়িদিকে একলা পেয়ে বলি, হ্যাঁ রে, তোর কাঁধে চেপে বসাটা কি ঠিক হ'ল?

নুড়িদি রন্টুকে আদর করতে করতে বলে, কী?

তুই আমার কথা শুনছিস না!

নুড়িদি চোখ পাকিয়ে বলে, আমাকে শোনাচ্ছিস কেন অসুবিধের কথা! তোর জামাইবাবুকে স্ট্রেটকাট বলবি। ব্যস!

বিরক্ত হয়ে বলি, আঃ! আমি কি আমার অসুবিধের কথা বলছি!

তবে কী বলছিস?

তোদের অসুবিধের কথা।

নুড়িদি রন্টুকে শূন্যে তুলে খিলখিল করে হাসে। তারপর ঠিক তার বরের ভঙ্গীতে বলে, সবই ঠাকুরের ইচ্ছা!

বিশুদার ঠিকাদারি কাজের চাপটা পড়ে শীতকালেই বেশি। ইটখোলাটারও মালিক সে। কোনো কোনো রাতে পেমেন্ট সেরে ফিরে আসতে বারোটাও বেজে যায়। ভীষণ বিব্রত বোধ করি। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করি কড়া নাড়তে। কিন্তু জামাইবাবুর কান যেন জন্তুদের। আমাকে চমকে দিয়ে হাসিমুখে দরজা খোলেন। বুঝতে পারি, এঘরেই বসে অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্য।

কুণ্ঠার সঙ্গে বেশি রাত হবার কৈফিয়ত দিতে গেলেই বলেন, না, না। ওই দেখো না, টেবিলল্যাম্পের সামনে বসে পরীক্ষার খাতা দেখছিলাম। আমারও বড্ড কাজের চাপ।

সেটা অবশ্য ঠিকই। সোফা-টেবিলটা সরিয়ে ক্যাম্পখ্যাটে বিছানা ও মশারি সব তৈরি রেখেই জামাইবাবু পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন। খেয়েদেয়ে শুয়ে

পড়েও দেখি, শিক্ষকটি আবার খাতা দেখতে বসেছেন। টেবিলবাতির আলোয় পাছে আমার ঘুমের অসুবিধে হয়, তাই আমার দিকে চেয়ার টেনে বসেছেন। মুখের একটা পাশে মৃদু আলো পড়েছে। ভারি অবাক লাগে মানুষটির এই মগ্নতা আর নিষ্ঠা দেখে।

পাশের ঘর থেকে কাসি আর হাঁপানির শব্দ শুনি। কোনো রাতে। তারপর জামাইবাবুর সাড়া পাই। এক রাতে উঠে দেখলাম, মায়ের দিকে ঝুঁকে বসে আছেন জামাইবাবু। বুকটা ডলে দিচ্ছেন। নুড়িদি পাশের ঘরে দিব্যি ঘুমোচ্ছে। জামাইবাবু আমাকে দেখে ব্যস্ত ভাবে বললেন, তুমি আবার কেন উঠে এলে? ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়েছি। এখনই কমে যাবে। আসলে শীত আর বর্ষায় মায়ের হাঁপানিটা বেড়ে যায়। যাও, যাও। তুমি শুয়ে পড়ো গিয়ে। আবার তো সেই ভোরবেলা বেরোতে হবে তোমাকে।

ছুটির দিন বলে আমার চাকরিতে কিছু নেই। বিশুদা বলে রেখেছেন, যেদিন বুঝবি কাজকম্মের চাপটা কম, সেদিন ইচ্ছে করলে মনসাতলায় কাটিয়ে আসিস। মাকেও তো মাঝে মাঝে দেখে আসা দরকার।

তেমনি একটা দিনে আমি বাড়ি না গিয়ে জামাইবাবুর বাড়িতেই দিনটা কাটাবো ভাবলাম। জামাইবাবু স্কুলে গেছেন। মাসিমা বারান্দায় রোদ্দুরে থামে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে একটু হাসলেন। তপু বলছিল, আজ তুমি ছুটি নিয়েছ।

বললাম, হ্যাঁ। আপনি কেমন বোধ করছেন আজ?

মাসিমা শ্বাসপ্রশ্বাস জড়ানো গলায় বললেন, ভালো না বাবা! ওষুধে আর কাজ হচ্ছে না।

নুড়িদিকে খুঁজছিলাম। ডাকলাম, দিদি! সাড়া না পেয়ে আবার ডাকলাম, নুড়িদি!

মাসিমা বললেন, রুন্টুকে পাখি দেখাচ্ছে বোধ হয়।

খিড়কির দরজাটা খোলা। বেরিয়ে গিয়ে দেখলাম, আগাছার জঙ্গলের ভেতর খোলামেলা ঘাসজমিটাতে রন্টু একটা লাল বল নিয়ে খেলছে। আর নুড়িদি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে—গঙ্গার দিকে দৃষ্টি। নিচের ঠোঁট কামড়ানো। আমাকে দেখে সে বলল, কী রে! আজ তো তোর ছুটি—তো মনসাতলায় গেলি নে যে!

কাছে গিয়ে বললাম, তোকে একটা কথা বলার জন্য থেকে গেলাম। বরং ওবেলা গিয়ে কাল ভোরের বাসে ফিরব।

নুড়িদি ভুরু কুঁচকে বলল, কী কথা!

তুই এমন কেন রে। তোর শাশুড়ির অসুখ বেড়েছে। সারা রাত ওঁকে নিয়ে জামাইবাবু ব্যস্ত থাকেন। আর তুই দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে পারিস?

নুড়িদি বাঁকা হেসে বলল, মুখে বুলি ফুটেছে বাবুর! নিজের চরকায় তেল দিগে যা!

রাগ করে বললাম, না—এ তোর ভারি অন্যায় হচ্ছে কিন্তু! এই বাচ্চাটাকে আপন করে নিতে পেরেছিস—সংসারটাকেও নিশ্চয় আপন করে নিয়েছিস, অথচ ওই রুগ্‌ণা ভদ্রমহিলাকে—

নুড়িদি ফোঁস করে বলল, তুই থাম্।

বলে সে রন্টুর সঙ্গে বল নিয়ে খেলতে থাকল। রাগটা সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম। মাসিমা'র কাছে বসে বললাম, জামাইবাবুকে বলব—বরং সদরের কোনো ভালো ডাক্তার দিয়ে একবার দেখিয়ে নিন।

বৃদ্ধা একটু হাসলেন। তারপর লাল সিমেন্টের মেঝেয় আঙুল দিয়ে অদৃশ্য আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বললেন, এ অসুখ সারে না বাবা। এ কালরোগ!

কী বলছেন? আজকাল হাঁপানি কোনো কঠিন অসুখ নয়। আসলে আপনার সারাক্ষণ সেবাযত্ন করার দরকার। দিদির আপনাকে দেখাশুনা সেবাযত্ন করা উচিত। ভীষণ নেগলেক্ট করছে দিদি!

কথাটা একটানে বলে ওঁর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলাম। একটু পরে আস্তে বললেন, রন্টুকে দেখবে, না আমাকে! রন্টুটা যে বড্ড জেদী হয়ে উঠেছে আজকাল। আগে এমন হলে তো বিপদে পড়তাম। ভাগ্যিস বউমা ওকে বুকে তুলে নিল!

ওঁর চোখের কোনায় জলের ফোঁটা দেখে বললাম, না। দিদি রন্টুকে নিজের ছেলের মতোই দেখছে, সেটা ঠিক। কিন্তু আপনার দিকেও তো লক্ষ্য রাখা উচিত।

বৃদ্ধা চোখে জল নিয়ে ফের একটু হাসলেন। না, না। বউমা খুব ভালো মেয়ে। রন্টুর মায়ের একেবারে উল্টো। সে ছিল বড্ড দেমাকী মেয়ে।

বৃদ্ধা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে খুব কষ্ট করে রন্টুর মায়ের কথা বলার চেষ্টা করছিলেন। কষ্টটা লক্ষ্য করে বললাম, থাক। বেশি কথা বলবেন না। হাঁপানি বেড়ে যাবে।

উনি এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে চাপা স্বরে বললেন, হতভাগী বড় নির্দয়া মেয়ে ছিল বাবা! তোমাকেই বলছি। রন্টুর দেড় বছর বয়স তখন। ভেবে দ্যাখো কথাটা! তার কথা ভেবেও তো—

হঠাৎ থেমে গেলে জিজ্ঞেস করলাম, কী মাসিমা?

বৃদ্ধার চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এলো। প্রচণ্ড শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বলে উঠলেন, বিষ খেয়েছিল!

চমকে উঠলাম। বললাম, সে কী?

হ্যাঁ। অথচ দেখছ তুমি, তপুর মতো ছেলে—সাত চড়েও মুখে কথা নেই। সবই তো এতদিন ধরে দেখছ তুমি! তার সামান্য একটা কথায় রাগ করে হতভাগী প্রাণ দিলে!...

তাহলে রন্টুর মা আত্মহত্যা করেছিল! বিশুদা বলেনি। কে জানে কেন, কথাটা শোনার পর থেকে কী একটা ভয় পিছু নিল। কথাটা কি নুড়িদি জানতে পেরেছে? যদি না জেনে থাকে, তাকে কি জানাবো আমি? ঠিক করতে পারছিলাম না। এই স্বর্গের কোনার দিকে একটি আত্মহত্যার ঘটনা কালো ছায়ার মতো জড়িয়ে আছে তাহলে!

স্বর্গটাই বদলে গেল আমার চোখে। সত্যিই কি কথাটা সামান্য ছিল যে তার জন্য বিষ খেতে হয় একটি শিশুর জননীকে? অথবা মেয়েদের মধ্যেই আছে কোনো হঠকারী প্রবৃত্তি, যা পৃথিবীকে নিমেষে লাথি মারতে পারে, স্বর্গকেও ত্যাগ করে নরকে ঝাঁপ দিতে এতটুকু কুণ্ঠা থাকে না?

তার চেয়ে বড় কথা, নুড়িদির মধ্যেও তো হঠকারী প্রবৃত্তি আছে। যতবার একথা ভাবলাম, শিউরে উঠলাম।

শীতের শেষে একদিন আকাশ মেঘলা করে বৃষ্টি। বিশুদা সেদিন বাইরে কোথাও বেরোয় নি। কল্যাণগঞ্জেই ছিলো। জিপে করে অফিসে এসে বললো, কাটু! আজ ফিস্ট করি, আয়।

আব্দুল নামে কর্মচারীটিকে মুরগী আনতে পাঠালো। দারোয়ান রামঅবতারকে পাঠালো ইটখোলার ম্যানেজার নগেনবাবুকে ডাকতে। দুজনে টিপটিপে বৃষ্টিতে ছাতি মাথায় বেরিয়ে গেল। বিশুদার দিকে তাকালাম। বিশুদা পাইপ সাফ করছিল। মুখ তুলে বলল, কী রে? কিছু বলবি?

হ্যাঁ, বিশুদা।

বলে ফ্যাল কথাটা।

একটু ইতস্তত করে বললাম, জামাইবাবুর আগের স্ত্রী স্যুইসাইড করেছিল। তুমি নিশ্চয় জানতে কিন্তু বলোনি। কেন বলোনি বিশুদা?

বিশুদা অবাক হয়ে বলল, আজ হঠাৎ একথা কেন তোর? কোনো গণ্ডগোল ঘটেছে নাকি?

আস্তে বললাম, না।

বিশুদা হাসবার চেষ্টা করে বলল, ধর, তেমন কিছু যদি হয়েই থাকে—তাতে কী আসে যায়? নুড়ি কি কষ্টে আছে? তপনবাবু কি তাকে জুলুমটুলুম করছে? যদি করে, বল, শায়েস্তা করে দিচ্ছি। নুড়ির দায়িত্ব সবার আগে আমার কি না?

একটু চুপ করে থেকে বললাম, কথাটা প্লিজ অন্যভাবে নিও না বিশুদা।

বিশুদা পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বলল, তুই আমার কাছে কৈফিয়ত চাইছিস, এই তো? তাহলে বলি শোন্। তপনবাবুর আগে স্ত্রীকে আমি খুব ভালোভাবেই চিনতাম। চিনতাম মানে—

বিশুদা একটু হাসল। বাঁকা হাসি।...তোকে অত কৈফিয়ত দেবো না। শুধু এইটুকুই আভাস দিচ্ছি, একজন অতিশয় সজ্জন ভদ্রলোক—মানে তপনবাবু, যাকে বিয়ে করেছিলেন, সে ছিল অত্যন্ত জেদী আর পাগলী টাইপ মেয়ে। আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। ব্যস! আর এ নিয়ে একটি কথাও তোকে বলব না। এমন দিনে তুই দিলি আমার মুডটা বারোটা বাজিয়ে।

চুপ করে বসে থাকলাম। ইটখোলার দিকে ঝাপসা ভিজে গাছপালার ভেতর কালো দুটো ছাতি আসছিল। চোখে পড়ল বিশুদার মুড যেন ফিরে এলো। হাসতে হাসতে বলল, নগেনবাবু সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে। ভীষণ পেটুক লোক জানিস তো?

আমি বিশুদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ভাবছিলাম, অতিশয় সজ্জন এক ভদ্রলোকের প্রতি যে পাপ করেছে বিশুদা, নুড়িদিকে তার হাতে তুলে দিয়ে কি তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে? এ কি সাংঘাতিক খেলা বিশুদার!

কিন্তু বিশুদা তো জানে না নুড়িদিরও এমনি এক প্রেমিক ছিল—এখনও সে মনসাতলায় বিশুদার মতো দাপটে রাজত্ব করছে!

আবার সেই চাপা ত্রাস আমাকে চুপিচুপি ছুঁল। ফিস্টের আনন্দটা নিতে পারলাম না। আকাশ সারাটা দিন মেঘলা। মাঝে মাঝে টিপটিপিয়ে বৃষ্টি ঝরছে। বিকেলের দিকে হাওয়াটা বেড়ে গেল। তখন বৃষ্টির দৌরাত্মও গেল বেড়ে। বিশুদা সন্ধ্যার মুখে জিপে চাপিয়ে আমাকে কালীতলার মোড়ে পৌঁছে দিয়েছিল। আমার কাছে ছাতি ছিল। একপাশে পোড়ো জমি, অন্যপাশে ঠাসাঠাসি একতলা সেকেলে বাড়ি। গলির রাস্তাটা সরু। এবড়ো খেবড়ো। জিপগাড়িটা জামাইবাবুর বাড়ি অব্দি পৌঁছুতে পারলে বিশুদা তাই করত।

কোনোরকমে ছাতিটাকে হাওয়ার ঝাপটানি থেকে বাঁচিয়ে প্রায় দৌড়ে বাড়িটার বাইরের বারান্দায় উঠলাম। ভিজে একেবারে জুবুথুবু অবস্থা। ঠকঠক করে কাঁপছিলাম শীতে। ঠান্ডা হিম হাতে দরজাটার কড়াটা একটু নেড়ে দিলাম। আশা করেছিলাম অন্যদিনের মতোই ঝটপট খুলে যাবে। কিন্তু খুলল না।

ক্রমাগত কড়া নাড়ছিলাম। তবু সাড়া নেই। জামাইবাবু কি বাড়ি নেই? বারান্দায় বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ছে। কড়া নেড়েও সাড়া পাচ্ছি না। তখন ডাকতে থাকলাম।

কিছুক্ষণ পরে যে দরজা খুলে দিল, সে নুড়িদি। মুখটা থমথমে। ভেতরে ঢুকলে সে দরজাটা বন্ধ করে চাপা গলায় বলল, বুড়িটা মারা যাচ্ছে।

ছাতিটা ফেলে দিয়ে ভেতরে গেলাম। এই ঘরটায় সেই প্রথম এসে একদিন এবং মধ্যরাতে আরেকদিন ঢুকেছিলাম। একটা পুরোনো বড় আকারের সেকেলে খাট। তার ওপর বৃদ্ধা চিত হয়ে শুয়ে আছেন। গলার ভেতর ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। জামাইবাবু ঝুঁকে তাকিয়ে আছেন। অঝোরে কাঁদছেন। আমাকে দেখে শিশুর মতো দুটো হাতে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, কাজল! মা চলে যাচ্ছেন! এখন আমি কী করব?

এর মিনিটখানেক পরে ঘড়ঘড় শব্দটা থেমে গেল। শরীর একটু নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল। জামাইবাবু তাঁর মায়ের বুকের ওপর মাথা ঠুকতে থাকলেন। ওঁকে জোর করে সরিয়ে দিলাম। তখন উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে ভেঙে পড়লেন কান্নায়।

নুড়িদিকে খুঁজছিলাম। সে নেই। ভাবলাম, তাকে ডাকি। জামাইবাবুকে সামলাতে বলি। তাকে প্রচণ্ডভাবে ভর্ৎসনা করি।

কিন্তু পরক্ষণে মনে হল, এ সময় সে হয়তো রন্টুকে আড়াল করে আছে মৃত্যু থেকে। সে দুর্যোগের রাতে দাহের কোনো ব্যবস্থা করা কঠিন। সকাল অব্দি অপেক্ষা করতে হল। জামাইবাবু তখন একটু শান্ত। প্রকৃতিও শান্ত। টুকরো মেঘ জমে আছে। কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে না। মেঘের ফাঁকে গঙ্গার ওপরে লাল একটু আভা।

জামাইবাবু নিজেই বেরিয়েছিলেন প্রতিবেশীদের খবর দিতে। শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করতে দুপুর হয়ে গেল। গঙ্গার ধারে-ধারে দুজনে ফিরে আসছিলাম শ্মশান থেকে। জামাইবাবু স্নান করেছেন এবং ভিজে কাপড় পরনে। আমি সঙ্গে তোয়ালে আর শুকনো জামাকাপড় নিয়ে গিয়েছিলাম। খিড়কি দিয়ে জামাইবাবু সোজা বাড়ি ঢুকে গেলেন। সেই সময় বাঁদিকে সেই খোলামেলা ঘাসজমিটার পাশে ছাতিমগাছের তলায় নুড়িদিকে দেখতে পেলাম। কোলে রন্টু, আর তার লাল বল।

চোখে চোখ পড়লে নুড়িদি এগিয়ে এলো। নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে বলল, হয়ে গেল?

হ্যাঁ।

তুই আজ তো অফিস যাচ্ছিস নে। মনসাতলায় ঘুরে আয় না!

জবাব দিতে যাচ্ছি, রন্টু বলে উঠল, দিদা!

নুড়িদি আকাশ দেখিয়ে বলল, তোমার দিদা ওখানে!

রন্টু আকাশের দিকে তাকাল। আমি সোজা বাড়ি ঢুকে গেলাম। হুঁ মনসাতলায় যাবো আজ।

মার্চে বিশুদার অন্নপূর্ণা কন্সট্রাকশনের কাজের চাপ খুব বেশি। সরকারি আর্থিক বছরের শেষ মাস। পাওনাকড়ি এ মাসেই সব মিটিয়ে নিতে হয়। বিশুদা নিজে যেমন ব্যস্ত, আমাকেও তেমনি ব্যস্ত করে তুলেছিলেন। সদরে গিয়ে আমাকেও দফতরে ধন্না দিতে ও সাধাসাধি করে বেড়াতে হচ্ছিল। তবে বিশুদার আবার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপও আছে। তাই বিলের পেমেন্ট শেষ অব্দি ঠিক সময়ে হয়ে যায়। মোটা অঙ্কের একটা বকেয়া বিলের পেমেন্ট পেয়ে বিশুদা এপ্রিল থেকে আমার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিলেন।

ফেরার সময় জয় মা কালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে এক ভাঁড় রাবড়ি কিনেছিলাম। জামাইবাবু টিউশনিতে গেছেন। সবে সন্ধ্যা সাতটা বাজে। নুড়িদির যা স্বভাব, দেরি করে দরজা খুলল। খুশি হয়ে তাকে মাইনে বাড়ার খবর আর রাবড়ির ভাড়টা দিতে গেলে সে ঝাঁঝাল স্বরে বলে উঠল, খামোকা পয়সা খরচ করা তোর স্বভাবে দাঁড়িয়েছে।

রাগ করে বললাম, রন্টুর জন্য কিনেছি।

নুড়িদি কিছু বলল না। ইদানীং কিছুদিন থেকে তাকে একটু গম্ভীর আর রাগী দেখাচ্ছিল। অনেক রাতে আবছা তার ঝগড়াঝাঁটির আভাস পেতাম। দিনে চলত তার জের, চলত মুখভার করে থাকা আর অল্পসল্প কথাবার্তায়। জামাইবাবু বলতেন, তোমার দিদি অম্বলের অসুখ বাধিয়ে বসেছে! এত করে বলি, ডাক্তারের কাছে চলো, যাবেই না। অথচ কিছু খেলেই অম্বল আর বমি। তুমি একটু বুঝিয়ে বলো না কাজল!

আমি কিছু বলতে গেলেই তো নুড়িদির সাফ কথা, নিজের চরকায় তেল দিগে যা!

জামাইবাবুর টিউশনি সেরে ফিরতে রাত ন'টা বেজে গেল। আমার মাইনে বাড়া আর রাবড়ির কথা শুনে খুব খুশি হলেন। তারপরই কেন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। গলার ভেতর বললেন, সবই ঠাকুরের ইচ্ছা।

কিছুদিন পরে একরাত্রে আবার ঝগড়াঝাঁটির শব্দ কানে এলো। আমার মনে সেই গোপন ত্রাস। এ রাতে সেই ত্রাস আমাকে আড়ি পাততে নিয়ে গেল।

বন্ধ দরজার ভেতর নুড়িদির চাপা গজরানি শুনতে পেলাম। এমন সাংঘাতিক কথা তুমি আমাকে বলতে পারলে। ওপরে দিব্যি ভালোমানুষটি সেজে থাকো, আর তোমার ভেতরটা এমন নোংরা আমি জানতাম না।

জামাইবাবু বললেন, আহা! কথাটা তুমি বুঝছ না তপতী! আমি তা বলিনি! আমি বলছি, আমাদের লোকাল ডাক্তারের হিসেবে ভুল হতেও পারে। বরং সদরে কোনো স্পেশ্যালিস্টকে দেখালে বোঝা যাবে।

কী বোঝা যাবে? নুড়িদি আবার গর্জে উঠল।

আঃ! অত চেঁচাচ্ছ কেন? জামাইবাবু শান্তভাবে বললেন। আরে বাবা আমি তো আনাড়ি নই! ভুলে যাচ্ছ কেন, রন্টুর মায়ের ঠিক একই সিম্পটম দেখেছিলাম। পেটে বাচ্চা এলে—

নুড়িদি বাধা দিয়ে বলল, তুমি ওই কথাটা বললে কেন?

কী কথা?

ন্যকামি করো না! একটু আগে কী বললে?

কী বললাম? ডাক্তারবাবু যা বলেছিলেন, তাই বললাম। তোমার পেটের বাচ্চাটা অন্তত ছ'মাসের।

এরপর নুড়িদি যা বলল, দ্রুত সরে আসতে হল আমাকে। জামাইবাবুর হিসেবমতো নাকি নুড়িদির জঠরে বিয়ের আগেই একটা ভ্রূণ ছিল। বারীনদার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সারারাত অস্বস্তিতে আর আমার ঘুমই এলো না।

ভোরে কিন্তু রাতের ওই অশ্লীল ঝগড়াঝাঁটির কোনো ছাপ দেখতে পেলাম না দুটি মুখে। জামাইবাবু বরাবরকার মতো নিজেই চা করে এনে আমাকে বিছানা থেকে ওঠালেন। ভেতরে রন্টুর কান্নাকাটি আর নুড়িদির আদুরে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল।

জামাইবাবু দুপুরে স্কুলে থাকেন। আমি খেতে এলে নুড়িদি বলে, ঢাকা আছে সব খেয়ে নিগে। একদিন দুপুরে খাওয়ার পর নুড়িদি যখন তার ঘরে রন্টুকে ঘুম পাড়াচ্ছে, তার কাছে গিয়ে ডাকলাম, নুড়ি! তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।

নুড়িদি শুয়ে থেকেই বলল, বল্।

অনেকদিন থেকে তোকে কথাটা বলব ভেবেছি, বলতে পারিনি।

নুড়িদি অভ্যাসমতো ঝাঁঝালো স্বরে বলল, ভনিতা রাখ। কী বলবি বল্?

আস্তে বললাম, তুই কি জানিস রন্টুর মা বিষ খেয়ে স্যুইসাইড করেছিল?

নুড়িদির মধ্যে একটুও চাঞ্চল্য দেখা গেল না। সে নির্বিকার মুখে বলল, জানি।

কে বলেছে তোকে?

তোকে কে বলেছে আগে বল্?

মাসিমা বলেছিলেন।

আমি পাড়ার লোকের কাছে শুনেছি।

কেন স্যুইসাইড করেছিল জানিস?

নুড়িদি একটু হাসল। হঠাৎ এসব কথা তুলতে গেলি কেন? নিজের চরকায় তেল দিগে যা।

নুড়ি! বিশুদার সঙ্গে রন্টুর মায়ের একটা সম্পর্ক ছিল। তাই বিশুদা—

আমি জানি! নুড়িদি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু কেন তুই এসব ব্যাপারে নাক গলাতে আসছিস? নিজের কাজে যা তো।

নুড়ি, আমার বড্ড ভয় করে!

নুড়িদি উঠে বসল। চোখ পাকিয়ে বলল, দ্যাখ কাটু! তুইও বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস! বেরো! বেরো বলছি!

চলে এলাম। ঠিক করলাম, এ বাড়িতে আর আমি থাকব না। আজই বিশুদাকে বলব।...

বিশুদার সেই অফিসঘরে আবার ক্যাম্পখাট পেতে শুই। হোটেল থেকে খেয়ে আসি। বিশুদা বলেছেন, ঠিকই করেছিস। আত্মীয়বাড়ি থাকাটা ঠিক নয়। ইদানীং আমিও ভাবছিলাম ব্যাপারটা। তা ছাড়া তোকে হোলটাইম পাওয়া খুবই দরকার। ভাবিসনে, কয়েকটা দিন কষ্ট করে থাক। পাশেই একটা ঘর তুলে দিচ্ছি। আরামসে থাকবি।

এপ্রিলের মাঝামাঝি একদিন মনসাতলা গেলাম। মাইনেকড়ি বিশুদা প্রতিমাসে ওই সময় নাগাদ দেয়। গত মাসে বাড়ি যাইনি। এম ও-তে টাকা পাঠিয়েছিলাম মাকে। সকালের বাসে বাড়ির সামনে নেমেই মাকে দেখতে পেলাম গেটে। কপটরাগ দেখিয়ে বললেন, কেন এলি? নুড়ির মতো তুইও আমাকে পর করে দিলি?

মায়ের কাঁধে হাত রেখে বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে বললাম, কেন? নুড়ি চিঠিফিঠি লেখে না?

মা চোখের জল মুছে বললেন, কোথায় চিঠি? আগে মাঝে মাঝে লিখত। আর সে কি চিঠি? খালি রন্টু আর রন্টুর কথা। ওকে চিঠি বলে? জামাইয়ের না হয় স্কুল-টুল আছে। সময় পায় না আসতে। তা নুড়ি কি আসতে পারে না একা? বাসে চাপলেই তো বাড়ির সামনে নামিয়ে দেবে। ও বড় নিষ্ঠুর মেয়ে রে! বরাবর একই স্বভাব।

তবু মা আমাকে পেয়েই এত বেশি খুশি যে নুড়ির কথা ভুলে গেলেন। বাড়িটা মেরামত করা দরকার এবং কোথায় কী করা দরকার, তাই নিয়ে অনর্গল কথা বলছিলেন মা। শেষে মিষ্টি হেসে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, এবার সংসারী হও বাবা! চাকরি-বাকরি পেয়েছ। রোজগারপাতি করছ। না—না কোনো কথা শুনব না। সানুবাবু একটা ভালো মেয়ের খোঁজ দিয়েছে। আজই ভাবছিলাম তোমাকে চিঠি লিখব, নয়তো লোক পাঠাবো। নিজে দেখে এসে পছন্দ-টছন্দ করবে।

পাত্রীর বংশ পরিচয় শিক্ষাদীক্ষাও শুনিয়ে দিলেন মা। তাঁর এই আনন্দকে নষ্ট করতে পারলাম না নুড়িদির খবরাখবর দিয়ে। কী দরকার ওর ব্যাপারে নাক গলিয়ে?

বিকেলে বাজারের দিকে ঘুরতে গেলাম। একানড়ে স্বভাবের জন্য ছোটবেলা থেকেই আমার সত্যিকারের বন্ধু বলতে তেমন কেউ নেই। তবু চেনাজানা লোকের সঙ্গে দেখা করতে বা কথাবার্তা বলতে মন্দ লাগছিল না। সন্ধ্যার মুখে হঠাৎ খেয়াল হল, একবার বারীনদার কাছে যাই।

কিন্তু বারীনদার বাড়ির দিকে ঘুরতেই মনে হল, কেন যাচ্ছি? ফিরে এলাম।

মনসাতলা এখনও গ্রামের স্বভাব ছাড়তে পারেনি। খুব শিগগির এখনও সন্ধ্যা হতে না হতেই নিশুতি রাতের নির্জনতা এসে পড়ে। চুপচাপ হয়ে যায় চারদিক। মাঝে মাঝে পিচ রাস্তায় ট্রাকের গরগর শব্দ। আবার স্তব্ধতা।

কিছুক্ষণ পরে দূরের ট্রাকের শব্দ কাছে আসতে থাকলে বুঝলাম মোটর সাইকেল আসছে। শব্দটি গরগর করতে করতে বাড়ছিল। বাড়তে বাড়তে কাছাকাছি কোথাও থামল।

একটু পরে বাইরের ঘরের দরজায় জোর কড়ানাড়ার শব্দ হল। ধুড়মুড় করে উঠে বসলাম। মা জেগে ছিলেন। তিনিও বেরিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁর মুখে হাসি। বললেন, আবার কে বিশু?

দরজা খুলে দেখি, ইটখোলার ম্যানেজার নগেনবাবু। খুশি হয়ে বললাম, আরে! আপনি হঠাৎ কোত্থেকে?

নগেনবাবুর মুখে হাসি নেই। আস্তে বললেন, বিশুবাবু পাঠালেন। আমি দুঃখিত, খবরটা আমাকেই আনতে হল।

কী? কী খবর? প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

নগেনবাবু আমার হাত ধরে বললেন, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। একটা মিসহ্যাপ হয়েছে। আপনার দিদি আজ সন্ধ্যায়—

স্যুইসাইড করেছে?

নগেনবাবু আমার হাত ধরে টানলেন।...মাথা ঠান্ডা রাখুন, কাজলবাবু। আসুন। বলে মায়ের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করলেন।...কিচ্ছু ভাববেন না। বিশুবাবু আছেন। সদরে হসপিটালে নিয়ে গেছেন আপনার মেয়েকে।

মা আর্তনাদ করছিলেন, আমাকে নিয়ে যাও। আমাকে নিয়ে যাও! মায়ের আর্তনাদ মোটরসাইকেলের প্রচণ্ড শব্দে চাপা পড়ে গেল।

কল্যাণগঞ্জের আগেই পিচরাস্তাটা মোড় নিয়েছে হাইওয়ের দিকে। হাইওয়েতে পৌঁছে দেখলাম মাঠের শেষে কৃষ্ণপক্ষের টুকরো চাঁদটা উঁকি দিচ্ছে। মাইল দুই এগিয়ে গঙ্গার ওপ্পর ব্রিজ। ব্রিজের চড়াই ওঠার সময় নগেনবাবু আবার একবার বললেন, কিছু ভাববেন না কাজলবাবু। বিশুবাবু আছেন।...

হাসপাতালের টানা বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে বিশুদার দেখা পেলাম। আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, মনটা শক্ত কর, কাটু!

নুড়ি বেঁচে আছে, না মরে গেছে?

কাটু, শি ওয়াজ অলরেডি ডেড। বিশুদা আস্তে বলল। সেবার আমাকে ঠকতে হয়েছিল—কিংবা ইচ্ছে করেই ঠকেছিলাম রে! এবার আমি ঠকতে চাইনি। ওই স্কাউন্ড্রেলটাকে এবার আমি রেহাই দিচ্ছি না।

বিশুদার কথা বুঝতে পারছিলাম না। শুধু বললাম, নুড়ি কেন বিষ খেল, আমি জানি বিশুদা! জামাইবাবুর কোনো—

বিশুদা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, হি ইজ এ মার্ডারার।

না—বিশুদা! ব্যাকুলভাবে বললাম। তুমি ভুল করছ। তুমি আগে আমার কথাটা শোনো!

বিশুদা শুনল না। নগেনবাবু আস্তে বললেন, কাজলবাবু, বিষ খেয়ে স্যুইসাইড করলে ভেজিন্যাল প্যাসেজে ব্লাড থাকে না। আপনার দিদিকে খুন করে সম্ভবত মুখে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়েছে।

জামাইবাবু—এমন সজ্জন ভদ্রলোক, অমন মাটির মানুষ—তিনি খুন করেছেন নুড়িদিকে? মাথা ঘুরে গেল। মনে হল, অতল খাদে গড়িয়ে পড়ছি। আর শুধু শুনছি, ঠাকুরের ইচ্ছা—সবই ঠাকুরের ইচ্ছা—সবই ঠাকুরের ইচ্ছা!...

বিশুদা বলেছিলেন, সারাজীবন মানুষ চরিয়ে খাচ্ছি। অথচ ওই একটা লোককে আমি চিনতে ভুল করেছিলাম। কিংবা আসলে হয়তো আমরা সব মানুষই একেকজন খুনী। কেউ পারি, কেউ পারি না।

নগেনবাবু বলেছিলেন, কথাটা ঠিক তা নয়। আমার ধারণা, এটা একটা

মেন্টাল ডিজিজ। দেখুন না, স্যুইসাইড করার ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। হঠাৎ কোনো এক সময় ঝোঁকের মুখে করে বসলেই হল। যেমন ধরুন, নকুলবাবুর ব্যাপারটা। দিব্যি ভালোমানুষ। হঠাৎ সামান্য একটু ঝগড়াঝাঁটি বউয়ের সঙ্গে—তারপর ঝুলে পড়লেন। তাই বলছিলাম, মেন্টাল ডিজিজ!

কে জানে কী! আমি খালি রন্টুর কথা ভাবতাম আর কানে ভেসে আসত তার আধো-আধো ডাক, মা—ম্মা—মা—ম্মা!

শুনেছিলাম, রন্টুকে তার আপন মামা এসে নিয়ে গেছেন। জামাইবাবু জামিন পাননি। কোর্টে এখনও চার্জশিট যায়নি। সি. আই. ডি তদন্ত করছে। বিশুদা উঠে পড়ে লেগেছে। কেন তার এই উদ্দীপনা? এও কি সেই প্রায়শ্চিত্ত করা, নাকি নিজের প্রেমিকার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এতদিনে—বড় বেশি দেরিতেই সে মেতে উঠেছে।

জুন মাসের এক ভীষণ গরমের দিনে মনসাতলা গেলাম। মায়ের শরীর জরাজীর্ণ হয়ে গেছে একমাসেই। হ্যাঁ, আমার এবার সত্যিই বিয়ে করা দরকার। মায়ের দেখাশোনার জন্য কচির মা নয়, একজন আপন কারুর থাকা দরকার।

বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে খেলার মাঠের পাশ দিয়ে বাঁকা ঝিলের ধারে গেলাম। ঝিলটা এখন কোথাও কোথাও শুকিয়ে খটখটে। কোথাও মাটিতে কোমল দূর্বাঘাস। ওপারে ভরাট মাটির জঙ্গলের ভেতর বিধ্বস্ত শিবমন্দির আর বটগাছের দিকে তাকাতে গিয়ে কাউকে বসে থাকতে দেখলাম। বিকেলের তেরচা আলোয় গত শরতের এক বিকেলের মতোই চিনতে ভুল হল না। বারীনদা!

দূর্বাঘাসে ঢাকা নরম খাতটা পেরিয়ে সোজা চলে গেলাম ওর কাছে। পায়ের শব্দে ঘুরে আমাকে দেখে বারীনদা হাসল।...কাটু! কবে এলি?

বারীনদা সেই প্রকাণ্ড ইটের চাবড়াটতে বসেছিল। সিগারেট টানছিল। ফের বলল, আয়, বোস। বোরোধানের জমিগুলোতে পাম্প চালিয়ে সেচ দেওয়া হচ্ছে। দেখতে এসেছিলাম।

বারীনদা! আস্তে ডাকলাম।

আমার ডাকে কিছু ছিল। বারীনদা একটু অবাক হয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, কী রে? কিছু বলবি?

তুমি নুড়িদিকে বিয়ে করোনি কেন বারীনদা?

বারীনদা ভীষণ চমকে গিয়ে বলল, কী বলছিস, মাথামুণ্ডু নেই!

বারীনদা তুমি কি জানো, নুড়িদির বিয়ের সময় ওর পেটে বাচ্চা ছিল?

বারীনদা এবার রেগে গেল। কাটু! আমার মেজাজ ভালো নেই। তাছাড়া তুই একজন এডুকেটেড ছেলে। মুখ দিয়ে কী উচ্চারণ করছিস নিজের দিদির নামে খেয়াল আছে?

এক পা এগিয়ে বললাম, তুমি ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী, বারনীদা!

কাটু, লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছিস কিন্তু!

বারীনদা, তুমিই ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী।

বারীনদা মুখ ভেংচে বলল, যা যা! যা পারিস করিস! এই বিশুর জোরে তোর জোর তো? বিশুকে বলিস, এ তল্লাটে যেন আর নাক গলাতে না আসে। খতম হয়ে যাবে একেবারে।

আমার পায়ের কাছে অনেক ধারালো ইটের টুকরো। ভাঙা শিবমন্দিরের সেই টুকরোর দিকে চোখ রেখে কিছু বলবো ভাবলাম, সেই সময় বারীনদা উঠে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে ডাকল, ভৈরব! ভৈরব!

ঢালু জমিটার দিক থেকে একটা মাথা বেরোলো।...কী হল দাদাবাবু?

বারীনদা পা বাড়িয়ে বলল, মেসিন বন্ধ করে দে। আর কার্তিককে ডেকে নিয়ে আয়।

নিষ্পলক চোখে তার চলে যাওয়া দেখছিলাম। আগাছার ঝোপের ভেতর দিকে এগিয়ে নিচের ঢালু বোরো ধানের সবুজ জমির সীমান্তে সে থামল।

না, সবাই খুন করতে পারে না। ইচ্ছে থাকলেও পারে না। আমি পারলাম না। আস্তে হেঁটে শুকনো ঝিলের খাতে নরম দূর্বায় পা ফেলতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, আমি হয়তো পারতাম। আমার পায়ের কাছে ধারালো শক্ত ইটের টুকরো পড়ে ছিল। ওই জানোয়ারটাকে এক আঘাতেই খুলি ফাটিয়ে শেষ করে দিতে পারতাম।

কিংবা হয়তো সত্যিই তাই করে এলাম।

একটা অলীক রক্তাক্ত মৃতদেহ পেছনে রেখে অবশ শরীরে আমি বাড়ি ফিরে চললাম।